

বঙ্কিমচন্দ্র।

কপালকুণ্ডলা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

"তোমারি চরণ করিয়ে স্মরণ, চলেছি তোমারি পথে।,
তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমায়, ধরি এই মনোরথে॥"

হেমচন্দ্র

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী বি. এল্. প্রণীত।

কলিকাতা,
শ্রীকেদারনাথ বসু বি. এ.

SOLE AGENTS :
BANNERJEE, DUTTA & Co.
54·7, College Street, Calcutta.

২৮ নং ঘইটকখানা রোড—কলিকাতা—"বকুলও্ প্রেসে"
শ্রীসর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



বঙ্কিমচন্দ্র।

কপালকুণ্ডলা।

ইতিবৃত্ত।

এই উপন্যাসখানি বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় অসম্পূর্ণ ও অসংশোধিত অবস্থায় যন্ত্রস্থ হয় নাই; প্রায় এক বৎসর যাবৎ ইহা গ্রন্থকারের নিকটে থাকিয়া সম্যক্ সংশোধিত হইতে পারিয়াছিল।

অদ্যাবধি ইহার সাতটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই গ্রন্থকার গ্রন্থখানি ভাল করিয়া দেখিয়া

দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। সম্প্রতি যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল, তাহাতে কিছু পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। পরিবর্ত্তন অতি সামান্য এবং সেই সামান্য পরিবর্ত্তনও গ্রন্থের একটি মাত্র চরিত্র—নবকুমারকে লইয়া।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন, এই উপন্যাসখানি বাহির হওয়া মাত্র বঙ্কিম বাবুর যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থকার বলিয়া খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই যশোজ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে সেই যশ পুনরুদ্ধারের জন্য কোন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলা প্রচারিত হইবা মাত্র একেবারে দুই খানি নাটকই যন্ত্রস্থ করিয়াছিলেন।

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

কাপালিক-প্রতিপালিতা কাননবাসিনী কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতা। বালিকাটিকে

যেন প্রকৃতি-দেবী সযত্নে বুকে করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা—প্রকৃতির কন্যা, সন্তান, অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যা ও কাপালিকের প্রতিপালিতা। কপালকুণ্ডলায় মাতৃ-অংশ প্রবল। প্রকৃতি স্নেহময়ী—কপালকুণ্ডলাও স্নেহময়ী ; তবে অদৃষ্টবাদ-পূর্ণ দেবতা-ভক্তি কপালকুণ্ডলা অধিকারী ঠাকুর ও কাপালিকের নিকট হইতেই পাইয়াছিল, মাতা তাহাতে প্রতিকূলতা করেন নাই। এই মূল কথাটি মনে রাখিলেই আমরা 'কপালকুণ্ডলা'কে বুঝিতে পারিব।

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্য গ্রন্থকার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগে তাহার কাননচর কুমারী-জীবন প্রকটিত হইয়াছে ; অন্য ভাগে তাহার মনুষ্য-লোকে সমাগত নবোঢ়ার অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে—শেষ ভাগে সমাজ-সংসর্গে তাহার যতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহার পরিণতি ও পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি আমাদিগের এ সমাজের ভাষা দ্বারা বর্ণনা করাও অসাধ্য। কপালকুণ্ডলা যে অর্থে যাহা বুঝিত, আমরা সে অর্থে তাহা বুঝি

না। কপালকুণ্ডলার অভিধান স্বতন্ত্র এবং আদ্যন্ত এই অভিধান স্বতন্ত্র রাখিতে পারাতেই কবির অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ স্বভাব-সন্তান, কই আর ত কোথাও দেখিতে পাই না? দেখাইবে মিরন্দাকে? মিরন্দাও অপূর্ব্ব সৃষ্টি বটে; কিন্তু, যে বালিকা কাননাভ্যন্তরে প্রতিপালিতা হইয়াও স্বামীর সহিত খেলিবার সময় 'You play me false my lord' বলিতে পারিল, তাহার সহিত কি আমাদিগের এই 'কপালকুণ্ডলা'র তুলনা হয়? দেখাইবে শকুন্তলাকে? কই, শকুন্তলায় ত কপালকুণ্ডলাত্ব দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। শকুন্তলা তপস্বিনী বটে, কিন্তু মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই সম্যক্ অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা কবির সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ চরিত্রে, এরূপ সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখিতে পাই না। ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াও আমাদিগের ভয় হইতেছে, পাছে কোন অযত্ন-বিন্যস্ত কথায় বা বিশেষণে কবির বহুযত্ন-নির্ম্মিত সেই অলৌকিক সৃষ্টি নষ্ট করিয়া ফেলি। কপাল-কুণ্ডলা বুঝিতে—এ জগৎ ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

কপালকুণ্ডলার জগৎ—কপালকুণ্ডলার অভিধান—আয়ত্ত না হইলে, কপালকুণ্ডলা বুঝা যায় না।

কপালকুণ্ডলার সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ এক দিন 'সন্ধ্যালোকে' সেই 'গম্ভীর-নাদী সাগরোপকূলে'। যখন আমরা নবকুমারের সহিত অনন্য-মনে সময়-পরিমাণ-বোধ-রহিত হইয়া জলধি-শোভা সম্ভোগান্তর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম "অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীর-নাদী বারিধি-তীরে, সৈকত-ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণী-সম্বদ্ধ; সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না, তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়।"

সেই মূর্ত্তি সেই কালের সেই প্রকৃতির সহিত যেন এক সুরে গাঁথা। নবকুমার এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। "রমণীও নবকুমারের ন্যায়

স্পন্দহীন, অনিমেষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থির দৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।” নবকুমারের ন্যায় রূপবান যুবক এই কপালকুণ্ডলার প্রথম নয়ন-পথে পড়িল। কপালকুণ্ডলা যে নবকুমারের রূপে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহা বুঝিও না—প্রকৃতি-শিশুর ন্যায় রূপে আসক্তি আর কাহার আছে ? তবে রূপে আসক্তি জনিত যে একটা লজ্জা আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাও, কপালকুণ্ডলায় তাহা ছিল না। তাহা থাকিতে পারে না। একটি সুন্দর ফুল দেখিলেও, কপালকুণ্ডলা যেরূপ তদ্দিকে চাহিয়া থাকে, নবকুমারের প্রতি সে ঠিক সেইরূপেই চাহিয়াছিল। এই দৃষ্টিতেই কবি প্রথমে তাহার প্রকৃতি বুঝাইয়া দিলেন। সেইরূপ, সেই অবেণী-সম্বদ্ধ কেশভার, সমস্তই যেন প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত।

স্নেহময়ী কপালকুণ্ডলার আরও একটি পরিচয় এখানে পাইলাম। “প্রকৃতি-প্রতিপালিতা রমণী

হৃদয়ে স্নেহ অপর্য্যাপ্ত। কপালকুণ্ডলা মৃদুস্বরে বলিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" সে ধ্বনি "যেন হর্ষ-বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগর-বসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল। বেসুরা হৃদয়তন্ত্রীর সুর মিলাইতে এরূপ রমণীর এরূপ কণ্ঠস্বরের এইরূপই ক্ষমতা বটে !

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পথ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইল। তাহার অন্তর্দ্ধানই বা কি সুন্দর! 'এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টিত করিতে হইবে; বনের অন্তরালে গেলে আর সুন্দরীকে (নবকুমার) দেখিতে পাইলেন না। বন-বেষ্টনের পর দেখেন যে সম্মুখে কুটীর।' নবকুমারের ন্যায় আমরাও ভাবিলাম—"একি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়া মাত্র!"

কিরূপ করিয়া যে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিলেন—এখানে তাহা বলিবার প্রয়ো-

জন নাই। কপালকুণ্ডলার প্রত্যেক কার্য্যেই আমরা তাহার মাতৃ উপাদান দেখিতে পাই। সেইরূপ করিয়া নবকুমারকে কাপালিকের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করাতে, সেইরূপ করিয়া তীরবৎ বেগে ছুটিয়া যাওয়ায়, সেইরূপ করিয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে খড়্গহস্তে বন্যদেবীর ন্যায় নবকুমারের নিকট চলিয়া আসাতে, তাহার হৃদয়খানি, তাহার কার্য্যপ্রণালী অতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে লইয়া এক দেবালয়ে গমন করিল। দেবালয়ের অধিকারী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমার-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিল। অধিকারী তাহাকে নিষেধ করিলেন। এই স্থলে আমরা কপালকুণ্ডলার কথাগুলি শুনিতে পাইলাম। এরূপ চরিত্র লইয়া খেলা করা সহজ কথা নহে। প্রকৃতির কন্যাকে লোকালয়ের ভাষা কহাইয়া চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা—অতি সাবধান, অতি শিল্পনিপুণ কারিকরের কার্য্য। আমরা নিম্নে অধিকারী ও কপালকুণ্ডলার সমগ্র কথোপকথন

উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহি, আমাদিগের মহাকবি কিরূপ কৌশলে এ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কপালকুণ্ডলার যেমন হৃদয়খানি, তেমনি কথার প্রণালী, তেমনি কার্য্যাবলী। কপটতার চিহ্নও ইহাতে নাই। অধিকারী বলিলেন, "যাইও না। ক্ষণেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

"কপালকুণ্ডলা। কি ?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না ?"

এরূপ কথায় অন্য হইলে কিরূপ উত্তর করিত, সহজেই অনুমান করা যায়। "কবে আমি তোমার ভিক্ষা অবহেলা করিয়াছি যে আজ আমাকে এরূপ কহিতেছ ?" এইরূপই কোন একটা বলিতে যাইত। বাক্যরচনায় অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা কিন্তু তাহা বলিল না। সে অধিকারীর কথার উত্তরমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিল. যেটুকু এখানে তাহার বলার দরকার, কেবল মাত্র সেইটুকুই সে বলিল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের

প্রশ্নোত্তরে কুন্দনন্দিনীর মত অতি ছোট খাট একটি জবাব করিল। সে বলিল, 'করিব না।' কপালকুণ্ডলা কি ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর করিতে পারে? অধিকারী বলিলেন, 'আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।' কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?' অধিকারী বলিলেন, 'গেলে তোমার রক্ষা নাই।' আবার কপালকুণ্ডলা কপালকুণ্ডলার ন্যায় উত্তর করিল, 'তাহা ত জানি।' অধিকারী বলিলেন, 'তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?' কপালকুণ্ডলা বলিল, 'না গিয়া কোথায় যাইব?' অধিকারী কহিলেন, 'এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।'

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী বলিলেন, 'মা কি ভাবিতেছ?'

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে "যে যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত, এখন যাইতে বল কেন?"

ইহা পড়িয়া আমরা জানিতে পারিলাম, অধিকারীর নিকটে কপালকুণ্ডলা সংসার সম্বন্ধেও দুই একটি কথা শুনিয়াছে। যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া যে অন্যায়, এ কথা প্রথমে তাহার মনে

হয় নাই, অধিকারীই তাহাকে এই জ্ঞানটি প্রদান করিয়াছেন। অধিকারী তাহার নিকটে পরম পূজ্য—এ কথা তাহার অন্তরের সহিত ঐক্য না হইলেও, কপালকুণ্ডলা কথাটি ভুলে নাই। আজ অধিকারীকে তদ্বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুনিয়া কপালকুণ্ডলা সেই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিল।

অধিকারী উক্ত কথার যথারীতি উত্তর করিয়া কপালকুণ্ডলাকে লইয়া ঘটনার শুভাশুভ পরীক্ষা-জন্য দেবী-পদে অর্ঘ্য দিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলা দেখিল, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অধিকারী এখন তাঁহার বৃদ্ধবয়সোচিত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিলেন, 'এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়,তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে ইহার সহিত যাইতে বলিতে পারি না।"

'বি—বা—হ।' এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। **কি করিতে হইবে?'**

*বৃহদক্ষরের মুদ্রিত কথাগুলি আমরাই বৃহদক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছি।

দেখিলে পাঠক কপালকুণ্ডলাকে ? এমন বিমুগ্ধা বালিকাযুবতী আর কোথাও কি দেখিয়াছ ?

একটি ষোড়শী যুবতীর মুখে ঐ কথা সুন্দর নয় কি ? কথাটি শুনিয়া প্রাচীন অধিকারীও বিস্মিত হইয়া ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বিবাহ স্ত্রীলোকের এক মাত্র ধর্ম্মের সোপান ; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে। জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে জানিতেন—তাই তাহার উপযোগী উত্তরই প্রদান করিলেন। বলিলেন 'জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।'

"অধিকারী মনে করিলেন সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন সকলই বুঝিলেন। বলিলেন, 'তাহাই ঠিক'।"

তবু কাপালিককে ত্যাগ করিয়া যাইতে কপালকুণ্ডলার মন সরিতেছে না। "তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন ?" অধিকারী এ কথার উত্তর করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে তাহার সতীত্বনাশের আশঙ্কা বুঝাইয়া দিলেন। কপালকুণ্ডলা তাহাই বা কতদূর বুঝিল জানি না—বোধ হয় ভাল বুঝিল না। 'অথবা স্বভাবপ্রদত্ত জ্ঞান

হইতে ঐটুকু বুঝিল। বুঝুক আর নাই বুঝুক, অধিকারীর কথায় সে স্বীকৃত হইল। বলিল, 'বিবাহই হউক'। অধিকারী ঘটকালি করিয়া যথাশাস্ত্র এ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। 'গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিকপালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।' ছায়াময়ী গোধূলিতে বিবাহ কপালকুণ্ডলারই উপযোগী।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা দেবীর পদে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন—অর্ঘ্য গ্রহীত হইল না। "কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভীতিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণ-চ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন"; অধিকারী বলিলেন, "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। * * * অতএব নিঃশব্দে চল।"

কপালকুণ্ডলা তাহাই করিলেন। অধিকারীর নিকট বিদায় গ্রহণকালে কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। "পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃৎ সে বিদায় হইতেছে।"

কপালকুণ্ডলার জীবন-নাটকের প্রথমাঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। এখন একবার কপালকুণ্ডলার এই কুমারী-জীবনটি পর্য্যালোচনা করা যাউক।

"কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টীয়ান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ ও তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।" এ কথা অধিকারী কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন—আমরা জানি না। যদি কপালকুণ্ডলার মুখে শুনিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, কপালকুণ্ডলার তখন এ সকল কথা বুঝিবার বয়স হইয়াছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার মুখে তাহা হইলে কি একদিনও তাহার মাতাপিতার কথা শুনিতাম না? বা মাতাপিতা তাহার অজ্ঞানাবস্থায় মৃত হইয়া থাকিলে, তাহার প্রতিপালিকার কথা শুনিলাম না? যে কপালকুণ্ডলা কাপালিককে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কুণ্ঠিতা হইল, অধিকারীর নিকট বিদায় গ্রহণকালে, অশ্রুজলে সিক্তা হইল, স্নেহময়ী সেই কপালকুণ্ডলার কি এরূপ বিস্মৃতি সম্ভবে? আমরা অনুমান করি, অধিকারী ইহা অন্যসূত্রে অবগত হইয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিয়া থাকিবেন। কপালকুণ্ডলা তাই এ কথা জানিতেন; কিন্তু সংসার-চরিত্র অবগত না থাকাতে, সে সকল কথা তাঁহার হৃদয়স্থ হইতে পারে নাই।" কপালকুণ্ডলার সমগ্র চরিত্র

এই একটি কথার উপর নির্ভর করে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কপালকুণ্ডলা এ সকলই জানিত ও বুঝিত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় তাহার হৃদয়খানিতে যেন একটি দুঃখের বা সংসার-বৈরাগ্যের স্রোত প্রবাহিত ছিল। নীরব-প্রকৃতি কপালকুণ্ডলা উহা কদাচ ব্যক্ত করিত না—সে গুলি লুক্কায়িত রাখিতে তাহার ক্ষমতাও ছিল। এই দুঃখের ভারে প্রপীড়িত থাকাতেই তাহার পরদুঃখ-কাতরতা, তাহার গম্ভীরতা, পরোপকারেচ্ছা এত বলবতী হইয়াছিল। সংসারের সুখ, নবকুমারের প্রণয়, এই জন্যই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই কি বঙ্গীয় বিধবা রমণীর ন্যায় কপালকুণ্ডলা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও আজীবন একটিবার হাসিল না—সেই দুঃখ-পরিমল বক্ষে করিয়া প্রান্তর-মধ্যস্থিত কুসুমটির ন্যায় অনাঘ্রাতা হইয়া প্রকৃতির কোলে বিলীন হইল? এইরূপ ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু আমরা কপালকুণ্ডলার কুমারী-জীবনে যেন কবির এই অভিপ্রায়টি স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাই আমরা ধরিয়া লইলাম যে, কপালকুণ্ডলা ইহা জানিত না বা বুঝিত না।

কপালকুণ্ডলা প্রায় নির্জ্জনেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিহঙ্গিনীর ন্যায় কপালকুণ্ডলা স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারিত। এইরূপ অবস্থায়, স্বভাবজ সমস্ত গুণই বিকশিত হইয়াছিল; হৃদয়ে স্বাধীনভাব, সরলতা, পরদুঃখকাতরতা, সার্ব্বভৌমিক স্নেহ-প্রভৃতি কতকগুলি প্রবৃত্তি সঞ্জাত হইয়াছিল। তাহার উপর, কপালকুণ্ডলা, কাপালিকের নিষ্ঠুরাচরণ প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিত; দেখিয়া স্নেহে তাহার হৃদয় ভরিয়া যাইত; অধিকারী স্নেহময়; তাঁহার উপদেশে—সেই স্নেহ উছলিয়া উঠিত।

এদিকে আশৈশব বনচারিণী বলিয়া কপালকুণ্ডলার স্বাধীনতার আনুরক্তি এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে কিছুতেই আমাদিগের সামাজিক রমণীবৃন্দের ন্যায় সমাজ-নিয়মাধীনা হইয়া একমাত্র স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিল না। এই আনুরক্তি ও সেই স্নেহ—অদৃষ্টবাদ ও ভৈরবীভক্তি যুক্ত হইয়া ভবিষ্যৎ কপালকুণ্ডলার অদৃষ্ট নির্ম্মাণ করিল। এই অঙ্কুরের ফলই তাহার ভবিষ্যজ্জীবনে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা তাহা ক্রমে দেখাইতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—

কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিকে নিম্নবর্ণিত অবস্থায় নিম্নবর্ণিতরূপে দেখিতে পাইলাম।

"কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র—অবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাহাকে দেখিলেন, তখন তাঁহার অধর-পার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল; মুখ গম্ভীর হইল, অনিমিকলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহে না—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।"

"ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কার-রাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপাল-কুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, 'ওকি

হইতেছে ?' মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।”

এবারে আমরা কপালকুণ্ডলাকে রূপবিমুগ্ধ নবকুমারের চক্ষে দেখিলাম না—রূপাভিমানিনী,জগতে অতুলনীয়া রূপবতী মেহেরউন্নিসার প্রতিদ্বন্দ্বিনী গর্ব্বিতা মতিবিবির চক্ষে, তাহাকে দেখিলাম। এ রূপ দেখিয়া সে অভিমানিনীও মুগ্ধা হইল—আপনার অলঙ্কাররাশি আত্মশরীর হইতে মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে পরাইয়া দিল। রূপবর্ণনা, রূপের প্রভাব বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল। কিন্তু কেবল ইহা দেখাইতে অপরোদ্ধৃত অংশ উদ্ধৃত করি নাই। ইহাতে দেখাইবার আরও জিনিস আছে। সেটি বিমুগ্ধা মতির মোহ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার সেই অপূর্ব্ব ঈষৎ বিস্মিতভাব, আর তাহার পর সেইরূপ করিয়া তাহার গাত্রে অলঙ্কাররাশি পরাইবার কালে, কপালকুণ্ডলার সেই বহু অর্থযুক্ত তূষ্ণীম্ভাব। এই স্থলে কবির কাব্যকৌশল অতি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। “মতির ভাব দেখিয়া কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।” এই ‘কিছু’ কথাটির মধ্যে যে কত কথা রহিয়া গিয়াছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না।

আর, যখন মতিবিবি অলঙ্কারগুলি পরাইতে লাগিল, কুন্দ-প্রকৃতি কপালকুণ্ডলা কিছুই বলিতে পারিল না—বলার ইচ্ছা হইল না, বলার আবশ্যকতাও বোধ করিল না। কপালকুণ্ডলা স্নেহ চিনিত, কিন্তু অলঙ্কার চিনিত না—কপালকুণ্ডলা অনুভব করিতে পারিত, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা জানিত না। কপালকুণ্ডলা কথার অর্থ বুঝিত—কিন্তু ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। তাই কপালকুণ্ডলা কিছু বলিল না। সে মতির ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল, অথবা হইল না।

পথে যাইতে যাইতে কিরূপে যে কপালকুণ্ডলা সেই অলঙ্কাররাশি ভিক্ষুককে বিতরণ করিল, তাহা পাঠকবর্গ এস্থলে একবার স্মরণ করুন। দেখিতে পাইবেন, কপালকুণ্ডলা কেন এখানে অবিচলিত ছিল। 'গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও ?' 'আর ভিক্ষুক দৌড়িল কেন' এই দুইটি কথায় তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। অলঙ্কারের সহিত মানুষের মনের যে কি সম্বন্ধ, তাহা কপালকুণ্ডলা জানিবে কিরূপে ?

এখন আবার আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া

নবকুমারের গৃহে সদ্যাগতা কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতে চাহি। কপালকুণ্ডলা বেশী কথা বলে নাই—কিন্তু সে যে কথাগুলি বলিয়াছে, তাহা আমরা উদ্ধৃত না করিয়াই থাকিতে পারিতেছি না।

কপালকুণ্ডলা এখন মৃণ্ময়ী নামে অভিহিত; এই মৃণ্ময়ী ও তাহার ভ্রাতৃজায়া শ্যামাসুন্দরী নবকুমারের বাড়ীতে প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে।

"শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশ-তরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, 'তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না?'"

"মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া (কপালকুণ্ডলাকে আমরা আর কখন হাসিতে দেখি নাই) শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।"

"শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, 'ভাল আমার সাধটি পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে?"

"মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

"শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

"মৃ। কেন[illegible] না?

"শ্যা। কেন দেখিবি? তোর [illegible] ভাঙ্গিব। পরশপাতর কাহাকে বলে জান?

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'না'।*

"শ্যা। পরশপাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়।

"মৃ। **তাতে কি?**

"শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

"মৃ। **সে কি?**

"শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সে পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,—

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
"কপালে সিঁথির ধার কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়তুল॥
"কুঙ্কুম চন্দন চুয়া; বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।

---

* বৃহদক্ষরে মুদ্রিত আমরাই করিয়াছি।

"সোণার পুতলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে॥

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'ভাল বুঝিলাম। পরশপাতর যেন ছুঁয়েছি, সোণা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল, চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোণার পুতলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ?

"শ্যা। বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ?

"মৃ। লোকের দেখে সুখ। ফুলের কি?

"শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল, প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল, বলিলেন, 'ফুলের কি? তাহা ত বলিতে পারি না। কখন ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।' শ্যামা কুলীনপত্নী।

"মৃণ্ময়ী কথার কোন উত্তর দিলেন না।

"শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, আচ্ছা—তাই যদি না হইল;—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?'

"মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, 'বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।'

"শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে মৃণ্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইলেন; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন 'এখন ফিরিয়া যাইবার উপায়?'

"মৃ। উপায় নাই।

"শ্যা। তবে করিবে কি?

"মৃ। অধিকারী কহিতেন, 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

"শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?'

"মৃণ্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।'

"শ্যা। কেন, কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল কেন?

"মৃণ্ময়ী কহিলেন, 'শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে

ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্ম শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন ; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাতদেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল ; 'ভাল মন্দ জানিতে মার কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না —অতএব কপালে কি আছে জানি না'।

"মৃণ্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।"

এই উদ্ধৃত অংশে কপালকুণ্ডলার সেই সরল প্রকৃতি—সংসার-জ্ঞান-শূন্যতা, স্বাধীনভাবে বন-বিচরণেচ্ছা, পাষাণে অঙ্কিত, রেখাবলীর ন্যায় তাহার চিত্তবদ্ধ অদৃষ্টবাদ—যেন মূর্ত্তিমান হইয়া ফুটিয়া পড়িয়াছে। মৃণ্ময়ী তাহার পূর্ব্বজীবন কিছু মাত্র বিস্মৃত হইতে পারে নাই। হিজলি পরিত্যাগকালে কালিকার পাদপদ্ম হইতে সেই ত্রিপত্রচ্যুতি কপাল-কুণ্ডলার হৃদয়খানি জুড়িয়া একটি গাঢ় কাল ছায়া অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বুকভরা কেবল সেই কথা। কাপালিক ও অধিকারী প্রতিপালিতা

কপালকুণ্ডলা বুঝি সর্ব্বদাই সেই কথা ভাবিত। কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করিতে কই, তাহাকে ত কখন শুনি নাই ? কপালকুণ্ডলার সে স্বভাব নহে। বিশেষ দুঃখ প্রকাশের ভাষাও তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত ছিল না। অতিরঞ্জিত বাক্যাবলী দ্বারা ভিন্ন এ জগতের কাহার দুঃখকে প্রকাশ করিয়া থাকে ? কপালকুণ্ডলা তাহা পারিত না। আর বোধ হয় কপালকুণ্ডলাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিত, 'তাহাতে সুখ ?' তাই কপালকুণ্ডলা সেই ঘোর, অতি ঘোর, মসীবর্ণ দুঃখের রাশি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই হউক, হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ় আলিঙ্গনে নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। তাহার শেষের কথাগুলি যেন উজ্জ্বলাক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কপালকুণ্ডলার সরলতা ও সংসারজ্ঞানশূন্যতা তাহার সেই 'না', 'তাতে কি', 'সে কি ?' এই ক্ষুদ্র কথাগুলিতে যেন সহস্রমুখ হইয়া প্রকাশ করিতেছে। "মনে কর সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?" এই কথাটি অতি গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক। এটি যেন কপালকুণ্ডলার মন্থিত চিন্তার্ণবের একটি অতি প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস—বাস্তবিকই ত। মনে কর সকলই

হইল, তাহা হইলেই বা তাহার কি সুখ? যখন শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, 'বল দেখি ফুলটি ফুটিলে কি সুখ? মৃণ্ময়ী আবার তেমনইভাবে উত্তর করিল। 'লোকের দেখে সুখ; ফুলের কি?' কপালকুণ্ডলা যদি আমাদিগের মতন হইত, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কথা বুঝিতে পারিত। লোকের যে ফুটন্ত ফুল দেখিয়া সুখ জন্মে, তাহা জানিতে পারিলে, ফুলেরও সুখ হয়। কিন্তু কপালকুণ্ডলা পদ্মাবতী নহে—এ কথা সে বুঝিত না।

শ্যামাসুন্দরী যখন কপালকুণ্ডলার সুখ কি, জানিতে চাহিলেন, তিনি বলিলেন, 'বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে'।

প্রকৃতিপালিতা কানন-বিহারিণী বিহঙ্গিনীর মতই কথা বটে। কথাটির সরলতাই বা কি বিস্ময়কর!

তৃতীয় অধ্যায়।—

কপালকুণ্ডলা এখন এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। তাহার বেশভূষা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। বাহিরের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়

সে সত্য সত্যই পরশমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে। 'মস্তকে কেশপাশ সুনিবদ্ধ কুসুমদাম পরিশোভিত। পরিধানে শুক্লাম্বর—নৈশ আকাশে অর্দ্ধ চন্দ্র-দীপ্ত অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।' গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'তাঁহার বর্ণ এখনও সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধ কৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল; যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে।' পাঠক বুঝিলে কি এ মলিনতা কিসের? এই একটি কথায় সেই স্বতঃপ্রকাশিত সংসার-জ্ঞান-শূন্য কুমারী-জীবনের সৌন্দর্য্যের সহিত, এখনকার যত্ন-শোভিত, বিবাহিত-জীবনের সৌন্দর্য্যের কি পার্থক্যই প্রকাশ পাইয়াছে, কবির এরূপ দু এক কথায় কতকগুলি ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা অতি অদ্ভুত।

কপালকুণ্ডলাকে বর্হির্দৃষ্টিতে ত এইরূপ দেখিলাম এখন একবার অন্তর্দ্দৃষ্টিতে তাহাকে দেখা যাউক।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপই পরোপচিকীর্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি শ্যামাসুন্দরীর জন্য দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে কানন হইতে ঔষধ বিশেষ তুলিয়া

আনিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার জন্য তিনি একবার তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে আধ আধ ভাবে নিষেধ করিতেছে—সম্পূর্ণ পারিতেছে না, কারণ শ্যামা এইখানে স্বার্থান্ধ। শ্যামাসুন্দরী বলিতেছেন, '* * * এত রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ ঝির ভাল? দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?' কপালকুণ্ডলা উত্তর করিলেন, 'ক্ষতিই কি? তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?' শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দলোকে মন্দ বলিবে।' কপালকুণ্ডলা বলিল, 'বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।' শ্যামা পুনরায় বলিলেন, 'তাত হবে না, কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।' কপালকুণ্ডলা পুনরপি বলিলেন, 'এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।' শ্যামা নিরুপায় হইয়া মনের কথাটা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, 'তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?'

কথা শুনিয়া কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, 'ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন, আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব; তাহা হইলে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'

দেখিলে ত পাঠক, কপালকুণ্ডলার আভ্যন্তরিক বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার পরোপকারেচ্ছা, স্বাধীন ভাব, সমস্তই অবিকৃত রহিয়াছে, অথচ একটু পরিবর্ত্তনও অবস্থাক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী। কপালকুণ্ডলা কিছু উদ্ধতা বা মুখরা হইয়াছে। এরূপ প্রকৃতির লোককে কোন নিয়মাধীন রাখিতে চেষ্টা করিলে, এইরূপই ঘটিবে। ইহা কপালকুণ্ডলার দোষ নহে। এ দোষ তোমাদিগের সামাজিক নিয়মের সহিত তাহার প্রকৃতির স্বাভাবিক বিরোধের। এ কপালকুণ্ডলা এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ ত হইবেই। এক বৎসরেই কি বিহঙ্গিনী পোষ মানিবে? সোণার হইলেও তাহার নিকট শিকল শিকলই বটে।

কপালকুণ্ডলার ঔদ্ধত্য, কেবল যে শ্যামার নিকটেই প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। স্বামী নব-

কুমারকেও সে ছাড়িয়া কথা কহিত না। কপালকুণ্ডলা রাত্রে যখন ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছিল—নবকুমার তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনিও তখন গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃণ্ময়ীর হাত ধরিয়া অতি কোমল ও স্নেহপরিপূর্ণ স্বরে তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিলেন। কপালকুণ্ডলা নবকুমারের কথা শুনা দূরে থাকুক, অপ্রসন্নতার সহিত তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না।' এই নবকুমার কপালকুণ্ডলার পরোপকারেচ্ছা বশতঃ দুরন্ত কাপালিকের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন। সুতরাং কথাটি তাঁহাকে বড় বাজিল। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না সত্য, কিন্তু অভিমানিনী সর্পিণীর হৃদয়ে কিছু আঘাত করিলেন। বলিলেন, 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

"কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও'।"

এ কি নির্দ্দয়তা নহে? নির্দ্দয়তা বই কি? কিন্তু কপালকুণ্ডলা কি করিবে? তাহার স্বেচ্ছাচারিণী প্রকৃতি সংসার বন্ধনে ক্লিষ্ট হইয়া ক্রমে

জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মে বাধা পাওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না। এখন পুনঃ পুনঃ তাহাকে বাধা দেওয়াতে সে বাধা বিঘ্নকে অনায়াসে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিল। শুধু তাই নহে, সেই জন্যই তাহার স্বাধীন স্বভাব ঔদ্ধত্যে পরিণত হইয়াছিল।

এইরূপে নবকুমারের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কপালকুণ্ডলা অন্যমনা হইয়া তাহার কুমারী-জীবন ভাবিতে ভাবিতে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহার পরে কিরূপে যে তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণবেশী পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল, তাহা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে একটি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। যখন ছদ্মবেশী পদ্মাবতীর সহিত কপালকুণ্ডলার সাক্ষাৎ হইল, উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। **প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন**; কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?'

আবার আমরা কবির সেই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাইলাম। কি মনোহর স্পর্শ! বিদ্যুৎ ক্ষণস্থায়ী হইলেও আলোকে চন্দ্রমাকেও পরাভূত

করে। উষা ক্ষণস্থায়ী হইলেও মনোহারীত্বে দিবা রজনী উভয়কে পরাস্ত করে। আর, বঙ্কিম বাবুর দুই একটি কথা অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও অনেক বিস্তীর্ণ বর্ণনাকে কাব্যাংশে পরাভব করে। উপরোদ্ধৃত বৃহদক্ষরে মুদ্রিত কথাটি আমাদিগের আর একদিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সেই, যে দিন কাননবাসিনী কুমারী কপালকুণ্ডলা নবকুমারসন্দর্শনে তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি অনিমিকলোচনে নবকুমারের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই দিনকার কথা মনে পড়িল।

কুমারীর সহিত বিবাহিতার, কাননবাসিনী যোগিনীর সহিত সংসারবাসিনী গৃহিণীর, কপালকুণ্ডলার সহিত মৃণ্ময়ীর—কি অপূর্ব্ব পার্থক্যই দেখিলাম। সত্যই কপালকুণ্ডলা "কতক দূর গৃহরমণীর স্বভাব-সম্পন্না হইয়াছিলেন।" তিনি ব্রাহ্মণকুমারের প্রশ্নের সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণকুমার কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তর দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা, তুমি রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে কিজন্য আসিয়াছ?" অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া

কপালকুণ্ডলা অবাক হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন, সুতরাং সহসা তাঁহার মুখ হইতে কোন উত্তর বাহির হইল না। ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ?' সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, 'আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ কাননমধ্যে তোমরা দুজনে এ নিশীথে কি পরামর্শ করিতেছিলে?'

এই এক বৎসরকাল ধরিয়া বিন্দু বিন্দু বাষ্পে যে একখানি তরল মেঘ সঞ্চিত হইয়া কপালকুণ্ডলার স্বভাব-সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতেছিল, সহসা তাহা নিরাকৃত হইল। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মৃণ্ময়ী আবার কপালকুণ্ডলা হইল। অজ্ঞাতপুরুষের নিকট কোন গৃহ-রমণীর কি এইরূপ কথা সম্ভবে? কিন্তু কপালকুণ্ডলা ত গৃহ-রমণী নহে? মৃণ্ময়ীর এখন মৃত্যু হইয়াছে।

ইহার পরে ভীত হইয়াও কপালকুণ্ডলা কিরূপে সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের বলিবার আবশ্যক নাই। তাহা কপালকুণ্ডলারই প্রকৃতি। কপালকুণ্ডলাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া রাখিয়া

যখন ব্রাহ্মণ-বেশী অন্যত্র বিলম্ব করিতেছিল, কপাল-কুণ্ডলা কিছু সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয় আসিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। পথে মনুষ্যপদধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন ব্রাহ্মণ-বেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভীত হইয়া তিনি আরও দ্রুতপদে চলিলেন। কিন্তু গৃহ প্রাপ্ত হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। কপালকুণ্ডলা ভিজিতে ভিজিতে যা প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন—বিদ্যুতালোকে দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গ ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতী প্রবাসী সেই কাপালিক! কপালকুণ্ডলার জীবনে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এই খানে সমাপ্ত হইল

বিদ্যুতালোকে কাপালিকমূর্ত্তি দর্শন হইতে শ্মশানভূমিতে নীত হওয়া পর্য্যন্ত, কয়েকটি ঘটনা

কপালকুণ্ডলার জীবনের আর এক দৃশ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বিবিধ ঘটনারাশি যেন একই লয়ে বাঁধা। সেই কাপালিকদর্শন, সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত, লুৎফউন্নিসার সহিত কথোপকথনে কপালকুণ্ডলার সেইরূপ আত্মত্যাগেচ্ছা, কপালের সেই অদ্ভুত ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শন, তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ, আর নবকুমারের সেই হৃদয়ভাব—সবগুলি মিলিয়া একটি বিচিত্র চিত্র হইয়াছে।

যখন কপালকুণ্ডলা একাকিনী ঔষধের সন্ধানে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কুমারী-জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল। "বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগর-বারি-বিন্দু-সংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমলনীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন সেই অমলনীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল।" এই জাগরিত স্মৃতি লইয়া কপালকুণ্ডলা যখন দেখিতেছিলেন, নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে—তখন নিঃসন্দেহই তাঁহার সেই কাপালিকের কথা মনে পড়িতেছিল। কাপালিকের সেই ভয়ানক বীভৎস কাণ্ড মনে করিতে করিতে যখন

কপালকুণ্ডলা এখানেও মৃত্যুসম্বন্ধীয় কথোপকথন শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব জীবনটি কাপালিকের সহিত একত্রিত হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণ-বেশী লুৎফউন্নিসার সহিত কথোপকথনে অন্যরূপ ভাবনা আসিয়া এতক্ষণ সেই চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। তাই নিশীথে একাকিনী ঐরূপ করিয়া লুৎফউন্নিসার হস্ত হইতে ভীতচিত্তে পলাইয়া আসিয়া, ঐরূপ তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন বিদ্যুতালোকে কাপালিকমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন—রুদ্ধগতি জলপ্রবাহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ একেবারে জলরাশি সবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, কপালকুণ্ডলার সেই চিন্তাগুলি তদ্রূপ বিস্মৃতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাঁহার হৃদয় প্রান্তরে প্রবাহিত হইল। "কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন।" আমাদিগের কবি এইরূপে ধীরে ধীরে কপালকুণ্ডলার সেই অন্তর্ন্যস্ত বাহ্য বিস্মৃত চিন্তাদৃষ্টিটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাপালিকের সহি

যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন; তাহা স্মরণ হইতে লাগিল। কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, তৎকৃত ভৈরবী-পূজা, নব-কুমারের বন্ধন এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল।

"পূর্ব্বদিকে ঊষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগর-হৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত, তাহাতে বসন্ত রঙ্গের পতাকা উড়িতেছে, নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধাশ্যামের অনন্ত প্রণয় গীত করিতেছে। পশ্চিম গগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণ ধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল, স্বর্ণ-মেঘ-সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী আসিয়া

আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্ নিরূপণ হয় না, নাবিকেরা তরি ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল। গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল; বসন্ত রঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল। বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; তরঙ্গ-মধ্য হইতে একজন জটা-জূট-ধারী প্রকাণ্ডাকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বাম হস্তে তুলিয়া সমুদ্র মধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে সেই ভীম-কান্ত-শ্রী-ময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরি ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?' অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল 'নিমগ্ন কর'। ব্রাহ্মণ-বেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, 'আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।' ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।"

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে কবি Byron হইতে

উদ্ধৃত করিয়াছেন, 'I had a dream, which was not all a dream.'

এই স্বপ্নের পর মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলা হইলেন।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া কপালকুণ্ডলা সেই বনবাসিনী ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকুমারের এক পত্র পাইলেন। ব্রাহ্মণ-বেশী সন্ধ্যার পরে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়েছে। সেই ব্রাহ্মণকুমার, সেই নিবিড় কাননপ্রদেশ,—কপালকুণ্ডলা সেই বনবাসিনী যোগিনী থাকিলেও বুঝি, কদাচ এ সাহস করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত রাত্রির নিদারুণ স্বপ্ন কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টবাদ ভৈরবী-ভক্তি প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহাকে আর একরূপ করিয়া তুলিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ-বেশীর সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। গ্রন্থকার লিখিলেন, "বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপাল-কুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না—সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহল-পরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; ভীম-কান্ত-রূপরাশি-লোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; নৈশ বন-ভ্রমণ-

বিলাসিনী সন্ন্যাসী-পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; ভবানী-ভক্তি-ভাব-বিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন; জ্বলন্ত বহ্নি-শিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।"

যথাকালে কপালকুণ্ডলার সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। পদ্মাবতী আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। কি অভিপ্রায়ে তিনি এখন সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন, সে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। হোমকারীর মনের অভিপ্রায় ও তাঁহার সহিত পদ্মার সাক্ষাৎ-বৃত্তান্ত সমস্তই কপালকুণ্ডলা শুনিলেন। কাপালিক যে স্বপ্নবৃত্তান্ত পদ্মাবতীকে বলিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহাও শুনিলেন। স্বপ্নটি এইরূপ;— ভবানী ভ্রূকুটি করিয়া, কাপালিককে বলিতেছেন, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্ব পুণ্যফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' কিন্তু ক্ষণপরে কাপালিকের প্রতি দয়া প্রকাশে বলিলেন,

'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যত দিন না পার আমার পূজা করিও না।'

"স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।" নিয়তিচক্র আর এক পাক ঘুরিল। অদৃষ্টজালে কপালকুণ্ডলাকে বেড়িয়া ধরিল। ভৈরবী-ভক্তের জীবনের পরিণাম স্থির হইল; অদৃষ্ট স্থির হইল।

"লুৎফউন্নিসা এরূপ সময়ে কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন, "** ** প্রণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'কি করিব?'

"লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, 'স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?'

"লু। বিদেশে—বহু দূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

"কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবী সর্ব্বত্র মানস-লোচনে দেখিলেন—কোথাও

কাহাকে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন 'তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি দাস দাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্ন-কারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।' "

পাঠক! বিস্মিত হইলে? যদি কপালকুণ্ডলাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়া থাক, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ইহাই কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি; ইহাই তাহার স্বাভাবিক উত্তর। সময়োচিত ত বটেই। এতৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"লুৎফউন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কিজন্য? লুৎফউন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ-সংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলার সেইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিসর্জ্জন ! কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তি-প্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে ; তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তিশ্রবণ, ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল, ভৈরবী যে সৃষ্টি-শাসন-কর্ত্রী, মুক্তিদাত্রী ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখে দুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই জগৎশাসন-কর্ত্রী, সুখদুঃখ-বিধায়িনী, কৈবল্য-দায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন ?

"তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার দুঃখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—

দুঃখের প্রত্যাশায় নহে! কদাচিৎ যদি আত্ম-কর্ম্ম-দোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তাহা হইলেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল। নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপাল-কুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধন ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

"যাহার বন্ধন নাই তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতি স্থাপন করিবে? নবীন করি-করভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?"

কপালকুণ্ডলার চরিত্র ব্যাখ্যাত হইল। নব-কুমারের প্রতি যে তাহার একাগ্র স্নেহ ছিল না, গ্রন্থকার তাহা কপালকুণ্ডলার কার্য্য দ্বারা বলাইলেন, নিজেও বলিলেন। আমরা ইহার কারণ পূর্ব্বে

ব্যাখ্যা করিয়াছি। একজনের প্রতি স্নেহ কেন্দ্রীভূত করিতে, কপালকুণ্ডলা পারিতনা ; তাহার হৃদয় সে-অধীনতাটুকু সহ্য করিতে শিখে নাই। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা কাননবাসিনী সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা অপূর্ব্বা রমণী।

"কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পন না করিব ? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে ?' প্রশ্ন করিতে ছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিন্ত উত্তর দিতে পারিতে-ছিলেন না। সংসারের অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের একটা বন্ধন আছে।

"কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকটভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিকপদার্থ প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল। যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, 'বৎসে আমি পথ দেখাইতেছি।' কপাল-কুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখি-লেন, যেন আকাশমণ্ডলে নব-নীরদনিন্দিত মূর্ত্তি।

গল-বিলম্বিত-নর-কপাল-মালা হইতে শোণিত স্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নর-কর-রাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল-জ্বালা-বিভাসিত, লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

"কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নব-কাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখন কখন নৃকপাল-মালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখন নয়নপথে স্পষ্ট বিকশিত হয়! কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।"

অদৃষ্টনেমীর আবর্ত্তন ফুরাইল। কপালকুণ্ডলার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, মানুষের যাহা কিছু তাহা এখন তাঁহার নাই। তিনি এখন যোগিনীশ্রেষ্ঠ। মনের যখন এরূপ অবস্থা, নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, 'কপালকুণ্ডলে!'

"কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। বুঝি মনে ভাবিলেন ভৈরবী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া

ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,—

'তোমরা কে ? যমদূত ?'

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন,—

'না না পিতঃ তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ ?' কথা দুইটির সহিত তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাবের ও তাঁহার প্রকৃত স্বভাবের কিরূপ লয় হইল দেখিলে, ইহাকেই নাটকত্ব বলে। যেরূপ কথাগুলির মনোভাবের সহিত মিল আছে, মনোভাবের সহিত আবার ঘটনাবলির সেইরূপই লয় আছে। কপালকুণ্ডলা তান মান-লয় বিশুদ্ধ একটি মনোহর সঙ্গীতই বটে !

"নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন, 'বৎসে ! আমাদিগের সঙ্গে আইস।' এই বলিয়া কাপালিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

"কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,

যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী ঘন ঘন হাসিতেছে, এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিক-গত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।”

কপালকুণ্ডলা এইরূপে প্রেতভূমে আনীত হইল। কাপালিক যথারীতি ভৈরবীর পূজা সমাধানান্তে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে বলিলেন।

নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একখণ্ড জলপূর্ণ শ্মশানকলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়াছিল; হতভাগার কেহ সৎকারও করে নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদ স্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন * * * নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া

শবমাংসভুক্ পশুসকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল; কেহ আক্রমণ করিতে আসিল; কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে, কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প।”

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘স্বামিন্। ভয় পাইতেছ?’ এইখানে আমরা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কিছু কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। দুই একটি রাগের কথা ছাড়া কপালকুণ্ডলাকে আমরা নবকুমারের সহিত বিবাহিতাবস্থায় কথা কহিতে শুনি নাই। প্রলোভনটি ত্যাগ করায় কবির মনের উপরে আধিপত্য যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি আমি ইহা নিশ্চয়ই পারিতাম না। এমন নায়ক নায়িকা পাইয়া দুইটা প্রণয়ালাপ না করাইয়া কি আমরা থাকিতে পারিতাম? কবি এই পুস্তকখানি লিখিবার সময়ে তরুণবয়স্ক হইলেও, মনের উপরে তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রকাশে তিনি সম্যক্ অভ্যস্ত দেখিতে পাই। এইরূপ ক্ষমতা লেখকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। কবির ক্ষমতা যথেষ্ট থাকি-

লেও কপালকুণ্ডলার ন্যায় চরিত্র লইয়া সর্ব্বদা খেলা করা তাঁহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের প্রণয়ালাপ সংঘটন করাইলে, কবি তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। কপালকুণ্ডলা সামাজিক প্রণয়িনী নহে।

নবকুমার গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, 'ভয়ে, মৃণ্ময়ী? তাহা নহে।' কপালকুণ্ডলা সমস্তই বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কাঁপিতেছ কেন? গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে কহিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী দুঃখে গলিয়া যায়, কেবল সেই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে৭ কে জানিত যে আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?"

গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া গেলেন যে কপালকুণ্ডলা এখন নবকুমারের কষ্ট অনুভব করিয়া আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের দুঃখে দুঃখিতা। বিপন্নের প্রতি দয়া দয়ার্দ্র চিত্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আমরা কপালকুণ্ডলাকে কি ভাবে দেখিয়া

ছিলাম? কোন প্রলয়ঝটিকা পরে প্রকৃতি যেমন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, কপালকুণ্ডলাও তাহাই করিয়াছিলেন। ভয়ে ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় অড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল—বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি কেবল সেই ভক্তির নিরতিশয়তার পরিণাম-ফল ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু নবকুমারকে দেখিয়া আবার তাহা স্বভাবস্থ হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বেও পতিত শবদেহ বেষ্টনে তাহার কিছু স্ফুরণ হইয়াছিল। যেরূপ অগ্নি-উৎপাদক প্রস্তরবিশেষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্তরবৎ থাকিয়াও দ্রব্যবিশেষের ঈষৎ আঘাতে অগ্নি উদ্গীরিত করে, কপালকুণ্ডলার মনেও ঠিক সেইরূপ, শ্মশান দেখিয়া অসংকৃত শব-দেহ দেখিয়া, পরিশেষে নবকুমারের ভ্রমমূলক দুঃখ রাশি দেখিয়া দুঃখাগ্নি বিভাসিত হইল। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, বুঝি কপালকুণ্ডলার পরিণাম ভাবিয়া তাহা আরও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। চিরদিন যাহার সহিত একত্র বাস করিয়া আসিয়াছি, তাহাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। কপালকুণ্ডলা ত নবকুমারের পত্নী। অন্য পত্নীর ন্যায় তাহার স্নেহ নাই বা

থাকিল, এরূপ অবস্থায় কি সে পাষাণবৎ স্থির থাকিতে পারে ?

নবকুমার কহিলেন, 'ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, 'কাঁদিবে কেন ?'

এই স্বরের সহিত লয় রাখিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিলেন, 'আবার সেই কণ্ঠ !'

নবকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে মৃণ্ময়ীর পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। বলিলেন 'মৃণ্ময়ী !—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।'

কপালকুণ্ডলা হাতে ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই।' দম্পতীর হৃদয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ নদীতে এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা একটি আড়লির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা বলিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।

মৃত্যুকালীন কুন্দের সেই ঈষৎ তিরস্কার-ব্যঞ্জক, মৃদুমধুর, স্নেহপরিপূর্ণ কথা শুনিয়াছি, দেস্‌দিমোনার সেই আসন্নকালীন প্রার্থনাবাক্য শুনিয়াছি, কিন্তু এত কোমল, এত মধুর, এত স্নেহপূর্ণ, এত স্বভাব-ব্যঞ্জক—কথা ত কখনও শুনি নাই!

"নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ী! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।'

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী, আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও! আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃণ্ময়ী!—না'—এইরূপ উচ্চশব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্র-বায়ু-তাড়িত এক বিষম নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায়

তটাধোভাগে প্রহত হইল, অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অন্তর্হিত হইল।"

গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইল! যেন আমাদিগের একটি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, যেন সঙ্গীতের বিরতি-ব্যঞ্জক স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আকাশের সহিত লীন হইয়া গেল! যেন প্রিয়জনের শবভস্মকারী শ্মশানাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল!

প্রকৃতিদেবী আপন ক্রোড়ে প্রিয়তম দুহিতাকে পুনর্গ্রহণ করিলেন। সেই উদ্বেলিত নদীগর্ভ-মধ্যে কপালকুণ্ডলা স্থান পাইল। প্রকৃতিপ্রিয় কবি প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতাটিকে প্রকৃতিময়ী করিয়া এই জগৎ হইতে লুকাইয়া রাখিলেন। মনোপ্রকৃতিতে

কিন্তু কপালকুণ্ডলা সেইরূপ অবেণীসম্বন্ধ কেশভার লইয়া ছুটাছুটি করিতে রহিল।

কপালকুণ্ডলার বিহঙ্গিনী। কাপালিকের ভয়ে পাখিটি নবকুমারের জালে পড়িয়া আবদ্ধ হইয়াছিল। নবকুমার তাহাকে যত্ন করিয়া লইয়া গিয়া সংসার-পিঞ্জরে প্রণয়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। পাখি-টিকে পোষ মানাইবার জন্য কতই না চেষ্টা করিয়া-ছিলেন—অভিমান ত্যাগ করিয়া,ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, পুরুষের ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া, কোমল হস্তে কতই না ইহাকে আদর করিয়াছিলেন! পাখিটি কিছুতেই পোষ মানিল না। এক দিনের তরেও নবকুমারের মনোমত বুলি বলিল না। এত যত্ন-পালিত হইয়াও এক দিনও সে যত্নের জন্য যত্নকারীকে মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত করিল না। পাখিটি গাহিতে ত জানিত! অমন সুস্বর, অমন মৃদুকণ্ঠ, অমন কোমলপ্রকৃতি না জানি গাহিলে কত সুন্দরই না গাহিতে পারিত! কিন্তু কিছুতেই সে পোষা পাখির মত নবকুমারের মনের গীত গাহিল না। অবশেষে এক দিন সময় পাইয়া নবকুমারকেই দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাঁহারই হৃদয়পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল। পিঞ্জর ভাঙ্গিল

ধটে কিন্তু শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিল না। আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারও অন্তর্হিত হইলেন। সব ফুরাইল।

কপালকুণ্ডলা কবির একটি অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টিমাধুর্য্য অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। কারণ, কপালকুণ্ডলা ভাবময়ী অথবা তা-হইলেও একরূপ বুঝান যাইত—কপালকুণ্ডলা ছায়াময়ী। সত্য বটে, কবি ইহাকে ভাষাময়ী করিয়াই আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন ভাষাই কপালকুণ্ডলার পূর্ণাবয়ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। কলাবিৎ যেমন সঙ্গীতকালে স্বীয় স্বরের অপূর্ণতা বা স্বর-বিচ্ছেদ কোন এক অবিরাম-ধ্বনিত যন্ত্র সাহায্যে পূরণ করিয়া থাকেন,আমাদিগের কবিরও সেইরূপ তাঁহার এ মনোহর সঙ্গিতটি ভাষায় গঠিত করিয়াও ইহাব পূর্ণতা ও বিচ্ছেদ পাঠকবর্গের মানসযন্ত্র ধ্বনিত করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ যন্ত্র যাহার ধ্বনিত হইবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার এ যন্ত্র সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিশিতে অসমর্থ, কপালকুণ্ডলা তাহার নিকট সম্যক্ অপূর্ণ। ভ্রমর, সূর্য্যমুখী তাহার জন্য হইতে পারে;

কিন্তু কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই তাহার জন্য নহে। কপালকুণ্ডলা চিত্র নহে—চিত্রের ছায়া। প্রতি-চিত্রগ্রহণকারীরা যেরূপ চিত্রিতব্য পদার্থের ছায়ামাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তাহাই যথাবিধি বর্ণে প্রতি-ভাসিত করিয়া,ঠিক সেই পদার্থের অনুকৃতি রচনা করে, পাঠকবর্গকে ও সেইরূপ ঐই ছায়া লইয়া মনো-মধ্যে কপালকুণ্ডলাকে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। ছায়াটি একটি যন্ত্রসাহায্যে উঠিয়াছে ; সে বাহাদুরী যন্ত্রের ; কিন্তু মূর্ত্তিগঠনে বাহাদুরী পাঠকবর্গের। তাই চিত্রনিপুণ পাঠকবর্গের নিকটে পূর্ণ মূর্ত্তি অপেক্ষা—এই ছায়ারই আদর অধিক।

পাঠক, কখনও কোন চিত্রগৃহে বর্ণ-গুচ্ছের (রঙ্গের ধাবড়ার) ছবি দেখিয়াছ ? এখানে এক ধাবড়া রঙ, ওখানে এক ধাবড়া রঙ, বহু যত্ন-বিন্যস্ত অথচ অযত্ন-বিন্যস্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রঙের ধাবড়ার ছবি কখন দেখিয়াছ ? কপালকুণ্ডলা সেইরূপ চিত্র। ইহাতে কোনও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই—অথচ চিত্রটি বড়ই মনোহর। যে চিত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে, তাহা হঠাৎ কেহ না বুঝিলে, বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ চিত্র না বুঝিলে, বুঝান দুরূহ ! ইহার

বিশ্লেষণ হয় না—অথবা বিশ্লেষণে ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তবে বুঝান যায়,—উহার সেই এক একটি বর্ণগুচ্ছের (রঙ্গের ধাবড়ার) সৌন্দর্য্য। তাহাই আমরা চেষ্টা করিতে পারি—কিন্তু সেই সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

ঐ দেখ সেই রকম এক ধাবড়া। পাণ্ডুবর্ণে ঐ কি লিখিত হইয়াছে ;—দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজ বক্ষে করিয়া অনলশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, মানব নাই ; তথায় পশু চরে না, পাখী ডাকে না, সমীরণও যেন বহে না। এহেন ভীষণ মরুভূমির মধ্যদেশে ঐ দেখ একটি পথিক ধীরেধীরে পদক্ষেপ করিতেছে। পথিক পথহারা—তাহার বদনমণ্ডলে বিষম আশঙ্কার চিহ্ন, গমনে বিষম ভ্রান্তির চিহ্ন। নয়নযুগল ভীতি-ব্যঞ্জক, সমুদ্রপতিতের ন্যায় নিরাশায় হাবুডুবু করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় জঠর ভস্মীভূত হইয়াছে। পথিক বিষম বিপদগ্রস্ত। আত্মহারা পথিক কি ভাবিতেছেন—সহসা এ কি ? —পথিকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধপ্ করিয়া এ কি জ্বলিয়া উঠিল। এ যে প্রদীপ্ত অনলশিখা—

আগুনের মধ্যে আগুন! পথিক জীবনে নিরাশ হইলেন—হা ভগবান্ বলিয়া সেই ভীষণ মরুভূমে, সেই ভীষণ অনলরাশিমধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চতুর্দ্দিকে আবার এ কি উত্থিত হইল। সেই ভীষণ মরুভূমি ভেদ করিয়া আবার ঐ কি এ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। এ যে সলিলের উৎস। শুভ্র, নির্ম্মল, সুশীতল, বারিপুঞ্জ! আহা মরি, কি সুন্দর চিত্র রে!—সেই ভীষণ মরুভূমিতে, সেই ভীষণ অনলরাশিমধ্যে আহা মরি মরি এ কি, এ সুন্দর দয়ার নির্ঝর রে! ঝর্ ঝর্, ঝর্ ঝর্ রবে কি ঐ মধুর ধ্বনি রে! স্বজন-পরিত্যক্ত বিজন প্রদেশে কাপালিক কর্ত্তৃক বধার্থ আনীত শ্মশানক্ষেত্রে নিরীহ নবকুমারের পার্শ্বে, ঐ কি মনোহর দয়ার ঝরণা রে! সেই মহাকালের ক্রীড়াভূমি ভীষণ কুরুক্ষেত্রে শর-শয্যাশায়িত ভীষ্মমুখে অর্জ্জুনশরপ্রোদ্ভিন্ন ধরিত্রী-ভেদী সলিলধারাও এত অমৃতময়ী নহে।

ঐ দেখ আর এক স্থানে ধাবড়া রঙ্গে ঐ কি লিখিত হইয়াছে;—মাতৃক্রোড়ে একটি যুবতী বালিকা। মায়ের আর সন্তান নাই, মায়ের পুত্রও ঐ,

কন্যাও ঐ, তাই কন্যাটি যুবতী হইলেও কালিকার ন্যায় এখন লালিত। এখনও সে বনে বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, এখনও সে মায়ের কাছে বালিকার ন্যায় আবদার করে। গাত্রে আভরণ নাই, দরিদ্র মাতা আভরণ কোথায় পাইবে? অথবা সে পাগল মেয়েকে আভরণ পিরান যাইতই না। কেশরাশি সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নয়নে বালহৃদয় প্রতিভাসিত, তেমতি সরল, তেমতি স্নেহপূর্ণ আবার যুবতীর ন্যায় তাহাতে গাম্ভীর্য্যও প্রকটিত রহিয়াছে। বালিকাটি মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া আছে, এমন সময়ে হঠাৎ কে আসিয়া তাহাকে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিয়া লইয়া গেল। বালিকা কাঁদিল না, অথবা কাঁদিল, কিন্তু আর্ত্তনাদ করিল না। সে কিছুই বুঝিল না—অথবা বুঝিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই করিল না। ঐ দেখ, ঐ মাতৃক্রোড়চ্যুত যুবতী বালিকা আজি বিবাহিত হইয়াছে। আজ **সংসার-রূপিণী** বিমাতা তাহাকে কত আদর করিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ আভরণে ভরা কেশপাশ সুনিবদ্ধ। মাতা নাই বলিয়া, মাতৃক্রোড়চ্যুত বলিয়া, সকলে তাহাকে

কত আদর করিতেছে। স্বামী অপরিমিত স্নেহ করিতেছে, ননদিনী প্রাণের অধিক যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার মন উঠিতেছে না। সেখানে সে যে মায়ের কোলে ছিল, এখানে যে এ বিমাতা! মাতৃহারা শিশু যখন মা মা বলিয়া রোদন করে, তখন তোমরা তাহার নিকটে যতই কেন মনোহর দ্রব্য ধর না, সে তদ্দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, বরং অন্য সময়ে যাহা সে আদর করিয়া বুকে করিত, সে সময়ে সে তাহা রাগ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। যুবতী আজ ঠিক তাহাই করিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার চক্ষু দুইটি ফুলিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যেন রাহুগ্রস্ত বিমলিন চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখ দেখি, চিত্রকরের কি অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য! সে মুখখানি কেমন ফুটিয়াছে—সে মনোভাবটি কেমন খুলিয়াছে! প্রকৃতি-দুহিতা ষোড়শী বালিকা কপালকুণ্ডলাকে সংসারের ক্রোড়ে আজ কেমন দেখিতেছ? আর কখন কোন বন্য বিহঙ্গিনীকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে সাধ হইবে? কোন বন্য ব্রততীকে বন হইতে তুলিয়া টবে বসাইতে ইচ্ছা যাইবে?

এই দেখ আর এক ধাবড়া রঙে এই কি লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সমাজের সংগ্রামের পরিণাম। কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, শ্রবণে, যে সকল শ্মশানক্ষেত্র দেখিয়াছ, যে সকল শোকসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছ, সব একত্রিত করিয়া ভাবিয়া একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ দেখি—ঐ শ্মশানভূমির প্রান্ত-ভাগে, উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথীর তটদেশের ঐ যুগল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর দেখি—ঐ প্রকৃতি আর ঐ সমাজের দিকে তাকাও দেখি—এরূপ আর কখন কি দেখিয়াছ? এরূপ হৃদয়ভেদী গাম্ভীর্য্যময় মধুর দৃশ্য আর কখন কি দেখিয়াছ? ঐ দেখ ঐ সামা-জিক প্রেমিক নবকুমার—ঐ দেখ ঐ স্বভাব-প্রেমিকা কপালকুণ্ডলা। উভয়েরই চরমোচ্ছ্বাস দেখ—উভয়েরই আদর্শভাগ দেখ। আরও দেখিতে চাও? তাহা হইলে তোমাদিগের নিকটে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। কপালকুণ্ডলা যে আমা-দিগের **প্রিয়তমা দুহিতা**—তাহাকে শ্মশানস্থ দেখাইলাম—তাহার ভস্মাবশেষ দেখাইতে পারিব না।

কিন্তু এ সকল ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য—সমষ্টির সৌন্দর্য্য

বুঝান যায় না। এ ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায়—কিন্তু সমষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে, নবকুমারের মত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে, গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে উচ্ছ্বসিত মনোভাব লইয়া দেখিতে হইবে। সংসারীর কাছে অমন প্রকৃতি-তনয়া ছায়াময়ী ভিন্ন ত উজ্জ্বল হইতে পারে না—ছায়াময়ী ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে—কল্পনার স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, কপালকুণ্ডলা অনুভবের জিনিস, বর্ণনার জিনিস নহে। ভাব বর্ণনা করা যায়, কিন্তু ভাবের ছায়া বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা বর্ণনা করা যায়, কিন্তু কল্পনার স্বপ্ন বর্ণনা করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা আদর্শ রমণী নহে, কিন্তু তবু চিত্ত-বিমোহিনী। কতক কারণ, এক প্রকার বলা হই-য়াছে। কপালকুণ্ডলা বিজন মরুভূমে বিমল সলিল-ধারা, কপালকুণ্ডলা বিমাতৃক্রোড়ে আদরপালিতা মাতৃহারা শিশু, কপালকুণ্ডলা প্রিয়তমা তনয়ার বিমলিন মুখচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে অতীতের স্মৃতি—রোগীর তন্দ্রা, নিদাঘের মলয় মারুত। এই স্বার্থময়, কপটতা-জড়িত সংসারে

থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সরলতাময়ী পরময়ী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে। কপালকুণ্ডলা যে সম্পূর্ণ সংসারছাড়া—তাই সংসারী আমরা, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট বড় অপূর্ব্ব, বড় মধুর। অমন ছবি ত আর কোথায়ও পাই। এমন সংসার-ছাড়া জীব আর কোথাও ত দেখিতে পাই না। কপালকুণ্ডলাকে যে আমরা এক সময়েও সংসারী বলিয়া, আপনার বলিয়া, বোধ করিতে পারিলাম না। আর এ প্রকার—যত ছবি দেখিয়াছি, সকলগুলিই এক সময়ে আমরা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিয়াছি। রমণীর চিত্তে স্বামী-প্রেমই জীবনস্বরূপ। এই জীবনটি আমরা প্রায় সকল ছবিতেই এই সংসারের বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। অন্য সময়ে সংসার ছাড়া ভাবিতে পারিলেও, এ সময়ে যেন তাহারা সম্পূর্ণ আমাদিগের বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ সাংসারিক বোধ হইয়াছে। তাই, মিরন্দা, শকুন্তলা হইতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্বত্ব অধিক। কপালকুণ্ডলার এই জীবনটি একবার দেখ দেখি—এখানেও দেখিবে আমাদিগের সংসারের কিছু নাই। নব

কুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনুরাগ বা মনোভাব কপালকুণ্ডলার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বটুকু এত অপূর্ব্ব ও এত মধুর যে, শুদ্ধ এইটুকু যেন কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের হইতে এক পৃথক জীব করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি মানবের মৌলিক প্রকৃতি—ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বটে, কিন্তু তবু সামাজিক মানবের প্রকৃতি হইতে তাহা কত অন্তর! কবিবর আমাদিগকে এই প্রকৃতি দূরে রাখিয়া একবার দেখাইয়াছেন—আবার কাছে আনিয়া, তুলনায় আর একবার দেখাইয়াছেন। এই মৌলিক প্রকৃতির সহিত আমাদিগের সামাজিক প্রকৃতি তুলনা করিলে, আমাদিগের হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হয়। সমাজ আমাদিগকে এখন এত দূরে আনিয়াছে! কোথায় কপালকুণ্ডলা, আর কোথায় আমরা—এই বিস্ময়টিও কপালকুণ্ডলার আর একটি সৌন্দর্য্য। সকল জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এত মনোহারিণী। এত এক রকম বলা গেল, কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। সে বিনাসূতার হার, আকাশের প্রতিমা ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২। পদ্মাবতী।

বঙ্কিম বাবুর কাব্যে প্রায়ই দুই একটি Duplicate চিত্র বর্ত্তমান থাকে। 'চন্দ্রশেখরে' যেরূপ শৈবলিনীর পার্শ্বে দলনী, চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে মীরকাসেম, ফষ্টরের পার্শ্বে তকি,'কপালকুণ্ডলা'রও ঠিক সেইরূপ কপালের পার্শ্বে মতিবিবি বা পদ্মাবতী বিরাজ করিতেছে। চিত্রগুলি এক প্রকারেরও নহে অথবা সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট বিরুদ্ধ প্রকারেরও নহে। একটি চিত্র দ্বারা যেন অন্যটির চিত্র সম্যক্ প্রতি-ভাসিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুগল চিত্র একত্রিত হইয়াই যেন কোনও একটি ভাবের বা কল্পনার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পাঠকের মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে এইরূপে যুগল চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ যুগলচিত্রের অঙ্কনে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক। যেরূপ নাটকাদির দৃশ্যপট অঙ্কিত করিতে হইলে, চিত্রকরের অভিনিবেশ সহকারে মনে করিয়া লইতে হয়, কোন্‌রূপ চিত্র এখন আঁকিলে দূর হইতে দর্শকবৃন্দ চিত্রটিকে চিত্রকরের অভীষ্ট

রূপে দেখিতে পাইবে, সেইরূপ এইরূপ যুগল চিত্র অঙ্কনেও কবির দেখিতে হইবে, চিত্রান্তরের কোন্ ভাবটি বা বর্ণটি চিত্রান্তর দ্বারা প্রকাশিত করিলে যুগল চিত্র দেখিয়া দর্শকের মন চিত্রকরের সমুদয় ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিবে। যুগল চিত্র বলিলাম বলিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কোন চিত্র ব্যাখ্যা করিতে আর একটি মাত্র চিত্রই ব্যবহৃত হয়। কোন মহান চিত্র ব্যাখ্যা করিতে দুই তিন বা ততোধিক চিত্রও অঙ্কিত হইয়া থাকে। গ্রন্থবিশেষের চিত্র গ্রন্থান্তরের দ্বারাও প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। কপালের চিত্র, কপাল, শ্যামাসুন্দরী ও মতিবিবি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হইয়াছে, পদ্মাবতীর চিত্র পূর্ণ বিকশিত। তাই পদ্মাবতীর চিত্র আমরা এখানে আলোচ্য বোধ করিলাম।

কপালকুণ্ডলা যোগিনী—পদ্মাবতী সম্রাজ্ঞী। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা, সংসার শাস্ত্রানভিজ্ঞা—পদ্মাবতী রাজধানীতে পরিবর্দ্ধিতা, মানব-মনোভাবে সম্যক্ অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা স্নেহময়ী—পদ্মাবতী পাষাণ-হৃদয়া। কপাল নির্ব্বিকার—

পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়াধীনা। কপালকুণ্ডলা অল্পভাষী—পদ্মাবতী মুখরা। কপাল আত্মবিস্মৃতিময়ী—পদ্মাবতী স্বার্থপরায়ণা, গর্ব্বিতা ;—রূপ, ধন, বুদ্ধি সকল বিষয়েই তাহার অহঙ্কার ছিল। এই সকল বিরুদ্ধ গুণ বাহিরে কিরূপ বিরুদ্ধভাবে ফুটিয়া পড়িয়াছে তাহাও দেখা যাউক।

কপালের রূপ-বর্ণনা ও বেশ-বর্ণনাস্থলে কবি লিখিয়াছেন—"অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি ! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত কেশভার, তদগ্রে দেহরত্ন ; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘ-বিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ, জ্যোতির্ম্ময় ; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য ; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে

নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্র-নিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যা-লোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।”

পদ্মাবতীর রূপবর্ণনাস্থলে গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে বলিতেছেন—“সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন; সেই সপ্তমী-চন্দ্রাকৃত-ললাটতলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগল মনে করুন; সেই পক্ক চূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনু-ভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু

সুকোমল স্নেহরসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ মাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসা বিস্ফারিত মদনরসে টলটলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রূর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে, দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মহান্ আত্ম-গরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরাল গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।”

এরূপ রূপবর্ণনা এক প্রকার চরিত্রবর্ণনা। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর আকৃতি দেখিয়াই যেন তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধান্ত করা যায়। ইহার অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এই চিত্র দুইটিতে দুই প্রকার অদৃষ্টবাদ বর্ণিত আছে। এক প্রকার প্রকাশিত, এক প্রকার প্রচ্ছন্ন। একটি মতবিশেষের স্বীকৃত, অন্যটি প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতী এই যুগল চিত্র অদৃষ্টবাদের যুগল মূর্ত্তি। আমরা শেষোক্ত অদৃষ্টবাদই আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় ধরিয়া লইলাম। আমরা এক্ষণে যাহা অদৃষ্টবাদ

বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি, সমগ্র জগতে তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা মহাকবির এই অদৃষ্ট-বাদটি সুস্পষ্ট করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া, মনোবিজ্ঞানের অতি কঠোর কথা কাব্যময় করিয়া ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়রসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা তাহা এস্থলে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য-প্রকৃতি সমস্তই বাহিরের অবস্থা দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। যেটুকু মনুষ্যত্ব সেই টুকুই মাত্র সাধারণের তুল্য সম্পত্তি—মানবচরিত্রের বীজ-স্বরূপ। মনুষ্য বলিলে যাহা বুঝায়, ঠিক তাহা দ্বারাই অন্য যে কিছু আমরা মানবচরিত্রে দেখিতে পাই, তাহা অবস্থাভেদে জন্মিয়া থাকে। এক মনুষ্য বলিলেই সমস্ত লোকগুলিকে আমরা পিণ্ডীকৃত করিয়া একটি মাত্র পদার্থ বোধ করিতে পারি। কিন্তু নাম ধরিয়া বলিলে তাহা পারা যাইবে না। মনুষ্য মাত্রই বিভিন্ন। ইংরাজিতে যাহাকে Accident কহে আমরা তাহারে অদৃষ্ট বলিলাম। যাহাকে তাহার Differentia কহে, আমরা তাহাকে 'বীজ' বলিলাম। এই বীজের সহিত অদৃষ্টবাদ যুক্ত

হইয়া আমাদিগের পৃথক্ করিয়া তুলিয়াছে। জগতে যত মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে সকলেরই বীজ এক, কিন্তু অদৃষ্ট বিভিন্ন।

এই অদৃষ্ট লোকের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাগুলির ক্ষমতা ভাল করিয়া বুঝিয়া এই মূলতত্ত্ব ঠিক রাখিয়া আমাদিগের মহাকবি কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল অবস্থার ফল কিছু প্রকাশ করা যায় না, যাহা যাহা সম্যক্ পরিস্ফুট তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইতে পারে। এইজন্য কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জনকজননীগত শিক্ষার কথা আমরা বড় একটা দেখিতে পাইলাম না। মূলে আমরা দুইজনকেই একটি প্রবৃত্তির সহিত গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। সেই প্রবৃত্তিটি স্বাধীনতা। একের রাজধানীতে স্বাধীন অবস্থায়, স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের, অন্যের কাননপ্রদেশে স্বাধীনাবস্থায় স্বাধীন মন লইয়া সহবাসের ফল 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রদর্শিত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর জীবনে এই স্বাধীনতা যেন বীজস্বরূপ—অন্য যাহা কিছু তাহাদিগের জীবনে ঘটিয়াছিল, সমস্তই অবস্থাভেদে।

কপালকুণ্ডলা কিরূপে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া, কিরূপে পরিণামপ্রাপ্তা হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। এখন লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিব।

গ্রন্থকার লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এদিকে লুৎফউন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত রসবাদ ইত্যাদিতে গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতিসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফউন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দম বেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, একার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন। যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন। যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে

যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল।”

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এক মায়ের দুই সন্তান। একটি সু, একটি কু। কপালের ভাগ্যে প্রায় সেই সু-টিই ঘটিয়াছিল; পদ্মাবতীর পক্ষে কু-টিই ঘটিল। স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র প্রকৃত অভিভাবক। এই অভিভাবক শূন্য হইয়া আগ্রার এক জন প্রধান ওমরাহের দুহিতা আদর-পালিতা পদ্মাবতী, ভোগবিলাসী মুসলমান সম্রাটের রাজধানীতে তাঁহারই নিকটে থাকিয়া ঐরূপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। লোকের উপরে সংসর্গের আধিপত্য প্রভূত—পদ্মাবতীর ভাগ্যে এই সংসর্গ কু-ই ছিল। এরূপ অবস্থায়ও সুযোগাভাবে অনেককে বাধ্য হইয়া সৎ থাকিতে হয়, পদ্মাবতীর পক্ষে তাহাও ঘটিল না। প্রথমে সেচ্ছাচারিতার প্রাবল্যে তাহার কোন বিঘ্ন ঘটে নাই, শেষে যখন তাহার পিতা কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাহাকে গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তখন ত তাহার চিন্তামাত্র রহিল না। কলঙ্ক ত হইলই তবে আর কেন পরমুখাপেক্ষী থাকি, এই ভাবিয়াই যেন পাপীয়সী পাপসমুদ্রে ঝাঁপ দিল।

অবস্থাক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্ট-বীজ এইরূপেই অঙ্কুরিত হইল।

কপালকুণ্ডলাও স্বাধীন প্রকৃতির। সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ বিজনে পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহা ত হইবেই। কিন্তু কপালের ভাগ্যে সংসর্গটি সু-ই হইয়াছিল। যে টুকু "কু" ছিল তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না, কারণ সেই "কু" টুকুর বিরুদ্ধ-বল অত্যন্ত প্রবল ছিল। কপালকুণ্ডলা চারিদিকেই ভৈরবীভক্তি দেখিতে পাইতেন। অধিকারী ও কাপালিক উভয়ই একান্ত-দেবীভক্ত ও অদৃষ্টবাদী; কপালও তাহাই হইল। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ কপাল ভাল বুঝিত না। সেই লোকালয় পরিশূন্য নিবিড় কাননপ্রদেশে শৈশব হইতে পরিবর্দ্ধিতা কপাল-কুণ্ডলা শিক্ষাবলে বা দেখিয়া শুনিয়া তাহা শিখিতে পারিল না। তবে মনুষ্যের বীজগত যেটুকু শিক্ষা আছে, তাহা অবশ্য কপালেরও ছিল। কিন্তু তাহাও অতি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। অন্যবিধ চিন্তানিবিষ্ট কপালের মনে যৌবনস্বভাব-সুলভ কোন চাঞ্চল্য থাকিলেও তাহা কপাল স্বয়ং ততটা অনুভব করিতে পারিত না। আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হৃদয়-

মধ্যে অতি প্রচণ্ড পাপবীজও যখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে—এত অতি সহজ কথা।

এইরূপে আমরা গ্রন্থকারের অনুগ্রহে কপাল ও পদ্মার অদৃষ্ট উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইলাম। অদৃষ্টও দর্শনীয় হইল। কপাল ও পদ্মা স্বাভাবিক চিত্র। এইরূপ যুগল চরিত্রের সমাবেশেই অদৃষ্টবাদটি এত সুন্দরভাবে ফুটিয়া পড়িয়াছে।

আমরা এখন পদ্মাবতীর চরিত্রের কাব্যাংশ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

লুৎফউন্নিসার জীবন-কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ নবকুমারের দর্শন-লাভ ও পরিচয়-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত; দ্বিতীয় ভাগ মেহেরউন্নিসার নিকট জাহাঙ্গীরের প্রতি তাহার অনুরাগের কথা অবগতিতে পরিসমাপ্ত; তৃতীয় ভাগমধ্যে লুৎফউন্নিসার অবশিষ্ট কাহিনী বা পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি ভাগ দিবা, সন্ধ্যা ও রজনীর ন্যায় সম্বন্ধবদ্ধ ও অবস্থানুযায়ী এইরূপই অবশ্যম্ভাবী। লুৎফউন্নিসার পাপাভিলাষ দিবাভাগে প্রচণ্ডতাপে স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া যেন সন্ধ্যাসময়ে স্বতঃই নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, এবং রজনীতে যেন উহা জগৎ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

জীবনের প্রথম ভাগে লুৎফউন্নিসা যৌবনের দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোতে জড়ের ন্যায় ভাসমান হইলেন। যেরূপ অবস্থায় এরূপটি ঘটিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যথেচ্ছা ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছু শমিত হইলে, লুৎফউন্নিসার আধিপত্যেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সেলিমের মহিষী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। যে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ মন লইয়া যেরূপেই থাকুক না কেন, তাহার মনে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আশা থাকিবেই। সেই আশাটির প্রকৃতিও আবার অবস্থানুযায়ীই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ভোগপরায়ণা লুৎফউন্নিসার ভোগ-লালসা একদিকে নির্ব্বিবাদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, কাজেই অন্যদিকে এখন তাহা পরিধাবিতা হইল। লুৎফউন্নিসা এখন সেলিমের প্রধানা মহিষী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ আশা তাঁহার পক্ষে সম্যক্ অনুচিতও হয় নাই। তাঁহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, রসজ্ঞতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সেলিমও তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ আশা না হইবে কেন? কিন্তু লুৎফউন্নিসাকে শীঘ্রই, এ আশা পরিত্যাগ করিতে

হইল। মেহের উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ দেখিয়াই তাঁহাকে ঠিক করিতে হইল যে মেহের-উন্নিসাই সম্ভবতঃ সেলিমের মহিষী হইবেন। এক আশা যায়, অন্য আশা আসে—জগতের রীতিই এইরূপ। লুৎফউন্নিসা এ আশা ত্যাগ করিয়া অন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন। যুবরাজ সেলিমের পুত্র খস্রুকে সিংহাসনে বসাইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল। এ সঙ্কল্পের উদ্দেশ্যগুলি গ্রন্থকার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। মেহেরউন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফউন্নিসার হৃদয়শেল। যাহাতে মেহেরউন্নিসার সহিত সেলিম মিলিত হইতে না পারেন, এই ইচ্ছা লুৎফউন্নিসার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। খস্রু সম্রাট হইলে সেলিমের এ আশা পূর্ণ হইবে না।

২। রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। খস্রুকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, পুরস্কার স্বরূপ কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণীহইবার সম্ভব। আধিপত্য-প্রিয় লুৎফউন্নিসা ইহা অভীপ্সিত মনে করিলেন। অন্য কারণও আছে। রাজপুরীর মধ্যে থাকিয়া

তাঁহার ভোগান্তরের কিছু বিঘ্ন হইতেছিল, বাহিরে সেরূপ কোন বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহেরউন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, এতদ্দ্বারা তাহারও প্রতিশোধ হইবে।

এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে লুৎফউন্নিসার সেই আধিপত্যপ্রিয়তা,প্রতিজিঘাংসা ও ভোগেচ্ছা বলবতী দেখিতে পাই। লোকের উদ্দেশ্য ত স্বভাবানুযায়ীই হইবে, তবে লুৎফউন্নিসার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইবে কেন?

সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যখন লুৎফউন্নিসা উড়িষ্যা গমন করিয়াই তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখনই তাঁহার সহিত নবকুমারের দেখা হয়। এই দর্শন ও পরিচয় পর্য্যন্তই তাঁহার জীবনের একভাগ বিস্তৃত। তাঁহার জীবনের এই ভাগে শেলি প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বেজ্হট্ (Bagehot) মানব-প্রকৃতিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাদিগের মনে সদসতে, কুমতি সুমতিতে,জ্ঞানে ও অভিলাষে বিসম্বাদ হইয়া থাকে তাহারা ইহার এক ভাগে অন্তর্নিবিষ্ট। আর

যাহাদিগের মনে ভাবসমূহের কোন বিরোধ নাই, একটানা জলের ন্যায় সে গতির কোন বাধা বিঘ্ন নাই, তাহাদিগকে তিনি অপর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে শেষের শ্রেণীস্থ লোককে হয় দেবতা, না হয় অসুর হইতে হইবে।

কপাল ও পদ্মা এই শেষোক্ত শ্রেণীর দুই প্রকার লোকের আদর্শস্বরূপ। উভয়েই স্বাধীনা—স্বেচ্ছাচারিণী—কিন্তু এক জনের ইচ্ছা নির্ম্মল সলিলরাশির ন্যায় বক্ষদেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত করিয়া বিজন কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল, অপরের অভিলাষ অদৃষ্টদোষে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রখর সূর্য্যালোকে কলঙ্করাশি সুপ্রকাশিত করিয়া বহুজনসমাকুল নগরমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। একটি দেবী, অন্যটি দানবী।

কিন্তু পদ্মাবতীর এই দানবী-প্রকৃতি চিরদিন এক রহিতে পারে নাই। কিছু দিনের জন্য আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া পদ্মাবতীর গতি আবার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, এক পদ্মাতেই আমরা উভয় প্রকৃতি দেখিতে

পাইয়াছি। পদ্মার জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগে সেই একটানা ভাব দেখিতে পাইলাম। মধ্যভাগে কিছুদিনের জন্য তাহা দুই দিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেই সদসতে বিরোধভাব পদ্মার জীবনের যে ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাকেই পদ্মার Crisis বা সঙ্কটকাল বলিতে হইবে। আমরা এক্ষণে সেই সঙ্কটকাল সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

স্বামীর নিকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পদ্মাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। একখানি বাষ্পীয় শকট যেন হৃদয়প্রদেশ দমিত করিয়া চলিয়া গেল। অতীতের স্মৃতি, স্বপ্নের ন্যায় হঠাৎ মনোমধ্যে জাগরূক হইল। এই ত সেই নবকুমার। যিনি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইলে, আজ পদ্মাবতীর হৃদয়ের ধন হইতেন! পদ্মাবতীও ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃতা হইলেন। এই অবসরে অজ্ঞাতসারে পদ্মাবতীর পাষাণ-হৃদয়ে একটি সুবীজ রোপিত হইল।

বলা বাহুল্য যে পদ্মার হৃদয়ে এ ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। রূপাভিমানী পদ্মা নবকুমারকে মোহিত করিবার জন্য বেশভূষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রফুল্লের কথা মনে

পড়িল। যদি পদ্মার মতি সম্যক্ পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আবার এখানে সেইরূপ নিরাভরণা দেখিতে পাইতাম। আর এক দিন দেখিতেও পাইয়াছি। কিন্তু গর্ব্বিতা পদ্মাবতী প্রফুল্ল নহে—রূপ ও ধনের প্রভাব দেখাইবার অভিলাষ, লোকমন মোহিত করিবার দুর্দ্দমনীয়া আকাঙ্ক্ষা পদ্মাবতী ছাড়িতে পারিল না। এইরূপে সজ্জিতা হইয়া পদ্মাবতী স্বামীর সহিত সপত্নী-সম্ভাষণে চলিলেন। প্রকৃতি-সজ্জিতা নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়া পদ্মাবতীর 'অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল।' বুঝি পদ্মা মনে মনে তখন নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'আমার সম্মুখে কি এই রূপের গর্ব্ব করিয়াছিলে?' রূপাভিমানিনীর এ সন্তোষ স্বাভাবিক। কিন্তু যখন জ্বালিত প্রদীপালোকে কপালের রূপরাশি বিস্তারিত হইয়া পড়িল তখন পদ্মার সে হাসি-হাসি ভাব দূর হইল। পদ্মার মুখ গম্ভীর হইল;—পদ্মা অনিমিষলোচনে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহে না;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা!"

অভিমানেরও একটা সীমা আছে।

পদ্মাবতী কপালকে স্বকীয় গাত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ অলঙ্কার দান বা এ সব ব্যাপার যে কেবল মাত্র কপালের রূপের জন্য হইয়াছিল আমরা এরূপ বোধ করি না। নবকুমারের পত্নী না হইলে কপাল আজ এরূপ আদৃতা হইত কি না সন্দেহ। নবকুমারের প্রতি পদ্মার আসক্তির সঞ্চার হইতেও প্রকাশ পাইয়াছে। "আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন" এই কথাটিতে তাহা কিছু ফুটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখনও আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই; যখন বিরলে পেষ্‌মন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি এ ব্যক্তি কে?" এবং গর্ব্বিতা পদ্মাবতী উত্তর করিল, 'মেরা খসম'; তখন সব বুঝিলাম। 'মেরা খসম' —কি সুন্দরভাবে কথাটি বসান হইয়াছে। সেলিম-পরিণয়-প্রার্থী পদ্মাবতী যেন গর্ব্বসহকারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পেষমন্‌কে উত্তর করিল, 'মেরা খসম'। সাধারণভাবে পদ্মার এ গর্ব্ব সমুদিত হয় নাই। পদ্মা এখন নবকুমারের প্রতি সত্যই আসক্তা।

পদ্মাবতীর পূর্ব্ব মনোভাব পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সেলিমের মহিষী হইতে যাহার অভিলাষ, সে আজি নবকুমারের প্রণয়প্রার্থী হইল। দুটি বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। একদিকে আধিপত্যেচ্ছা ও কুমতি, অন্য দিকে প্রণয় ও সুমতি সজ্জিত হইয়া পদ্মার হৃদয়প্রদেশে সংগ্রাম করিতে লাগিল। এই বিরুদ্ধ ভাব লইয়া পদ্মাবতী মেহেরউন্নিসার কাছে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলেন। সকল বিষয়েরই নূতন যেমন আদর পায়, পুরাতন সেরূপ নহে। আজ পদ্মার নিকট সুমতি ও প্রণয় নূতন পদার্থ। পদ্মা কিছু তদ্দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তোমরা, সুমতির বাহাদুরি বজায় রাখিতে ইচ্ছা হইলে,তাহার বলাধিক্য বর্ণনা করিতে পার; আমরা কিন্তু নূতন বলিয়াই পদ্মার মনে এরূপ ভাবপ্রাবল্য হেতু ব্যাখ্যা করিব। প্রণয়ের ও সুমতিরও যে কিছু ক্ষমতা না ছিল এমত নহে, তবে তদপেক্ষা তাহাদিগের নূতনত্বেই যেন পদ্মার আকর্ষণ বেশী স্বাভাবিক বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু একস্থলে প্রণয়-লক্ষণের মধ্যে বিনা প্রসঙ্গে প্রণয়পাত্রের কথা উত্থাপন একটি লক্ষণ

বলিয়া গিয়াছেন। আমরা বর্দ্ধমানের পথে পদ্মাকে আজ সেই লক্ষণাক্রান্ত দেখিব।

"যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেদিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষ্মনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষ্মনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'পেষ্মন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?'

পেষ্মন কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেমন আর দেখিব?'

মতি কহিলেন, 'সুন্দর পুরুষ বটে কি না?'

লক্ষণের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইল। পেষ্মনের সহিত এরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে অন্য এক সংবাদ উপস্থিত হইল। খস্রুকে সিংহাসনারোহণের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, আগ্রা হইতে এরূপ সংবাদ আসিল। নবকুমার-চিন্তা এখন কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হইল। এই সময়কার কিছু কথোপকথনও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

"অনুপায় দেখিয়া পেষ্‌মন বলিল, 'তবে কি হইবে?'

মতি কহিলেন, 'এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনু-রাগিনী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তহে জাহাঁগীর শত সের আফগান বধ করিলেও মেহেরউন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহেরউন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।'

পে। মেহেরউন্নিসার মন কি প্রকার জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, 'লুৎফউন্নিসার অসাধ্য কি? মেহেরউন্নিসা আমার বাল্যসখী, কালি বর্দ্ধ-মানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহেরউন্নিসা বাদসাহের অনুরাগিনী না হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।'

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ

হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষ্‌মন্ জিজ্ঞাসা করিল, হাসিতেছ কেন ?'

মতি কহিলেন, 'কোন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে।'

পে। কি নূতন ভাব ?

মতি তাহা পেষ্‌মন্‌কে বলিলেন না।"

যে পরিমাণে পদ্মার এক দিক্‌কার আশা কমিতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহার অন্য দিক্‌কার সঙ্কল্প সুস্থির হইতে লাগিল। শান্তি পদ্মার ভাগ্যে ছিলনা।

পদ্মাবতীর জীবনের মধ্যভাগের কথা বলিতে গিয়া একটি কথা মনে পড়িল। পদ্মার সহিত মেহেরউন্নিসার সাক্ষাত ও কথোপকথনে আমাদিগের কবিবর তাঁহার আর এক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার তৃতীয়খণ্ডস্থ তৃতীয় পরিচ্ছেদ নাটকাংশে উপমারহিত।

"মতিবিবি ও মেহেরউন্নিসা প্রতিযোগিনীদ্বয় একমনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই চতুরা, উভয়েই বাক্‌পটু, উভয়েই নিজের কথা না বলিয়া অন্যের মনের সংবাদ জানিতে চেষ্টিত। মেহেরউন্নিসা বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। পদ্মা

তাঁহার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন ও তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, কি ছলে সেলিমের কথা উত্থিত করিবেন। চতুরা পদ্মাকে অনেকক্ষণ এ কথা ভাবিতে হয় নাই। তিনি চিত্রলিখন উপলক্ষে মেহেরউন্নিসার সৌন্দর্য্যের কথা উত্থাপন করিয়া, সেলিমের প্রতি সেই সৌন্দর্য্যের প্রভাব বর্ণনা করিবেন ও তদ্দারা মেহেরউন্নিসার মনোগত ভাব কতক স্পষ্ট কথায় ও কতক কথোপকথনের ভাবে বুঝিয়া লইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তাই মেহেরউন্নিসা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চিত্র কেমন দেখিতেছ?' পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, 'তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে, তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, তাই দুঃখের বিষয়।'

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত, দুঃখের বিষয় কেন?

চতুরা মতিবিবি সুযোগ পাইয়া বলিলেন, 'অন্যের তোমার মত চিত্রনৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।' মেহেরউন্নিসা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, 'কবরের মাটিতে

মুখের আদর্শ থাকিবে।' লুৎফউন্নিসা তখন হেমচন্দ্র-মনোরমার কথোপকথন শুনিয়া গিরিজায়ার মত লক্ষণ গণনা করিতেছিলেন কি না জানি না, আমরা ত গণিতে আরম্ভ করিলাম। এ গাম্ভীর্য্য ও এরূপ কথা দেখিয়া ও শুনিয়া বুঝিলাম যে মেহেরউন্নিসার মনে মনে এইরূপ একটি দুঃখের স্রোত বহিতেছে যে তাঁহার এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ব্যবহার হইল না। বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে এ লক্ষণটি বড় ভাল নহে। লুৎফউন্নিসা সুযোগ পাইলেন। মেহেরউন্নিসার এই দুঃখোচ্ছ্বাস ধরিয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিতে পারিবেন ভাবিয়া যেন ঈষৎ হর্ষের সহিত জাঁকিয়া বসিয়া কথাটির সূত্র ধরিলেন। কিন্তু এবারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মেহেরউন্নিসা এ প্রশ্নের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। লুৎফউন্নিসার অস্ত্র ব্যর্থ হইল। মেহের সগর্ব্বে আত্মরক্ষা করিলেন। কথোপকথন চলিতে লাগিল। এবারে মেহের-উন্নিসাই আক্রমণকারী—লুৎফউন্নিসা যখন বলিলেন যে, 'আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ, জন্মিতে পারে' মেহের নিজের ভুবনমোহিনী হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ?

যুবরাজের না তাঁহার মহিষীর ?'—আমরা আবার গণিলাম নং ২। বিনা প্রসঙ্গে সেলিমের কথা উঠাইবার চেষ্টা। লক্ষণ আরও মন্দ। লুৎফউন্নিসা এ অস্ত্রাঘাত গায়ে পাতিয়া লইলেন। আত্মরক্ষা আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারণ সেলিমের কথা উত্থাপিত করাতে তাঁহারও উদ্দেশ্য। মতি কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, 'এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও ? উভয়েরই অসন্তোষ হইতে পারে।' মেহের আবার আক্রমণ করিলেন। বলিলেন, 'কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ করিতেছ না কেন ? শুনিয়াছিলাম কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন, তাহার কতদূর ?' আমরা আবার গণিলাম নং ৩। মেহের ক্রমে উঠিতেছেন। সেলিমের খাসবেগমের কথা তাঁহার অন্তরের সদালোচ্য বিষয়। সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইলেন। লুৎফউন্নিসা এবারে আত্মরক্ষার্থ একটু আক্রমণও করিলেন। দিল্লীশ্বরের মহিষীর দুঃখের ভাগটুকু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। বুঝি মনে করিলেন, ইহা দ্বারা মেহেরের সে পদ কতদূর বাঞ্ছনীয় পরীক্ষা করিবেন। লুৎফউন্নিসার আবার জয়।

হইল। মেহের বলিলেন, 'যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন ?'. আমরা গণিলাম নং ৪। এ বাসনা মেহেরউন্নিসার কাছে 'স্বর্গাদপি গরিয়সী।' লুৎফউন্নিসা ভাবিলেন; মেহেরউন্নিসার হৃদয়ে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। তাই কিছু স্পষ্টতর হইয়া বলিলেন, 'সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহেরউন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।' এবার কথাটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেহেরউন্নিসা মুখ নত করিলেন। আত্মসংযম করিয়া বলিলেন,

'ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। (আমরা আবার গণিলাম নং ৫—এ কথা কেন ?) কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে সের আফ্গানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে সের আফ্গানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মিত হইয়া কথা কহিও না।

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না। বরং আরও সুযোগ পাইলেন, 'তুমি যে

পতিগতপ্রাণা তাহা আমি বিলক্ষণ জানি! এই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধানে থাকিও।'

চতুরা পদ্মার ঐক্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। প্রকারান্তরে তিনি মেহেরউন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ জানাইলেন। এ বড় বিষম কথা। তোমাকে একজন ভালবাসে, এ কথা তোমার নিকট বলিয়া অনায়াসেই তৎপ্রতি তোমার অনুরাগ আছে কি না অতি সহজে জানিতে পারা যায়। লুৎফউন্নিসা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখন প্রায় সিদ্ধকাম হইতে চলিলেন। এ কথার মুখ্য ফল কিছু হইল না। বুদ্ধিমতী মেহেরউন্নিসা যেন মোটা কথায় আত্মরক্ষা করিলেন; এ আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বলিলেন, 'এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা।' লুৎফউন্নিসা আবার মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, 'বৈধব্যের আশঙ্কা।' এই কথা কহিয়া তিনি মেহেরউন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় ও আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায়;

দেখিতে পাইলেন না।” চতুরা মেহেরউন্নিসা সদর্পে কহিলেন, বৈধব্যের আশঙ্কা! সের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদসাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না—আমরা আবার গণিলাম নং ৬। আকবর বাদসাহের জীবিতাবস্থা ও তদবস্থায় মেহেরউন্নিসার মনোবাসনা পূরণের অসম্ভাবিতা মেহেরউন্নিসার মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইত।

আকবরের মৃত্যু না হইলে, মেহেরউন্নিসার এজন্য অস্থির হওয়া বৃথা, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। কথাটি অন্যভাবে খুলিয়া আসিল। লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন কি না জানি না। তিনি বলিলেন, ‘সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবর শাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?’ মেহেরউন্নিসা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কাঁদ কেন?’ মেহেরউন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

কহিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?"

বাঁধ ভাঙ্গিল। নির্ঝরিণী পর্ব্বত-গহ্বর হইতে ঝর ঝর রবে ছুটিয়া পড়িল। সংযমিত হৃদয়ের আবেগ মুক্তরশ্মি হইল। কেন যে হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই একরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।

মতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গ্রন্থকার লিখিলেন, "যিনি পরে আত্মবুদ্ধিপ্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিত হইলেন। ইহার কারণ মেহেরউন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতিবিবি এ স্থলে কেবল মাত্র স্বার্থপরায়ণা।"

কি বলিয়া যে এই অধ্যায়টির প্রশংসা করিব, জানি না।

গ্রন্থকার আবার লিখিলেন,

"এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন ? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রমাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েক দিন

গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।”

মতি যে কেন ইহা তখন বুঝিল না অথচ আনন্দিত হইল, আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মতি যদি তাহা বুঝিত, আমরাও তাহা একরূপ বুঝিতাম। বুঝিতাম যে এরূপ অনেক সময় ও অবস্থার সমাবেশ হয় যে, একদিকে প্রলোভনের দারুণ আকর্ষণ অন্যদিকে প্রলোভন-ত্যাগেচ্ছা মানব-হৃদয়ে বিষম বিরোধ জন্মাইয়া দেয়। মনে ভাবি যে, প্রলোভন ত্যাগ করিলে ভাল হয়, ত্যাগ করা উচিত, অথচ এরূপ ক্ষমতা নাই যে সে প্রলোভন সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ করিতে পারি। এরূপ অবস্থায় যদি কোন ঘটনা বশতঃ প্রলোভনটি স্বতঃই দূরীভূত হয়, আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কোন একটি মদ্যপ বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর কখনও মদ খাইবে না, কিন্তু তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে হাতে পাইলে সে মদ ত্যাগ করিতে পারে। সে গৃহে আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একটা মদের বোতল রহিয়াছে। সেই লুচি-মণ্ডার পাত্র সমীপে উপবিষ্ট রুগ্ন লোভী ব্রাহ্মণের ন্যায়

ভাবিতে ভাবিতে সে সেই মদ্যপাত্র সমীপে গেল। গিয়া দেখিল যে সে মদ্যপাত্রে জল রহিয়াছে, মদ্য নাই ; এরূপাবস্থায় তাহার মনে যেরূপ ভাব হইবে, পদ্মাবতীর তাহাই হইল। বিনা আয়াসে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিয়া তাহার এ আনন্দ হইল। কিন্তু এরূপ আনন্দ ত অজ্ঞাতসারে হইতে পারে না! এ আনন্দের কারণ বুঝিতেই ত আনন্দ, তাই বলিতেছিলাম যে, শেষের কথাগুলি না থাকিলে ইহা একরূপ বুঝিতাম।

এইরূপে পদ্মাবতী বিনাক্লেশে সঙ্কটকাল অতিবাহিত করিলেন। নবকুমারের প্রতি আসক্তি এখন নির্ব্বিবাদে একটানা স্রোতে হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইল। পদ্মাবতী জীবনের তৃতীয় কালে উপনীত হইলেন।

এই কালের বর্ণিতব্য বিষয় দুইটি। পদ্মাবতীর অনুতাপ ও আসক্তি। আমরা যথাক্রমে এখন তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মাবতীর সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রন্থকার পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার অতি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিলেন।

"লুৎফন্নিসা আজ আত্মমন্দিরে। বেশ-ভূষা পরিত্যক্ত হইয়াছে—নয়নে পূর্ব্বে যেরূপ একটি বিদ্যুৎ-কটাক্ষ প্রকাশ পাইত তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মা পেষ্‌মনকে কহিতেছেন, 'এই পোষাকটি তুমি লও।' এতদুপলক্ষে পেষ্‌মনের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইল তাহার সমস্তগুলি বলিবার এখানে স্থান নাই। লুৎফউন্নিসার আগ্রাত্যাগ সংবাদ শুনিয়া যখন পেষ্‌মন কহিল, 'এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল?' লুৎফউন্নিসা কহিলেন, "কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম কি ফললাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তিজন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এপর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এতদূর করিলাম তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজ এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই,

এক মুহূর্ত্তজন্য কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পর্ব্বতনির্ঝরিণীর ন্যায়—প্রথমে নির্ম্মল ক্ষীণধারা বিজনপ্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায় তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়, শুধু তাহাই নয়; কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর মরুভূমি নদী-হৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই কর্দ্দমময় নদী-শরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে?"

পে। আমি ইহা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না তাহা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না

হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক-রাত্রে যে সুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিয়াছি—

পে। কি বুঝিয়াছ?

লু। আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণরত্নাদিতে খচিত, ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া রক্ত-শিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই?

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকেও ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না!

লু। তবে পাষাণী নইত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি

তোমাকে ভালবাসেন তাঁহাকে কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল দিল্লীর বাদসাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফউন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।”

কি তীব্র মর্ম্মভেদী অনুতাপ! আগুনের ন্যায় যেন ইহা পদ্মাবতীর হৃদয়-প্রদেশ দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইতেছিল। পদ্মাবতীর শিক্ষাফল এই অনুতাপসূচক বাক্যাবলীতে প্রকাশিত রহিয়াছে। এ অনুতাপ সামান্যা রমণীর নহে—এ অনুতাপ জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা অথচ পাপনিরতা কামিনীর। পদ্মার এ অনুতাপ না জানি পৃথিবীর কত শত লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ কিন্তু শুধু শিক্ষায় কি হয়?

আমরা পদ্মার এ অনুতাপ সম্বন্ধে দুইটি কথা

বলিব। একটি, এই অনুতাপ এরূপ সহসা কেন উৎপন্ন হইল? আর একটি, এ অনুতাপের প্রকৃতি—ইহার অন্তর্নিহিত সত্য ও নির্ম্মল জ্ঞান।

অভিলষিত পাপকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এ অনুতাপের সূচনা হইল। আরও এক কথা। নিয়ত নির্ব্বিবাদে পাপাচরণ করিতে পাইয়া পাপের স্পৃহা সহজেই পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া চলিতেছিল। যদি সে এরূপ স্বেচ্ছাচারিণী না হইতে পারিত, তাহার এ পাপস্পৃহা পরিত্যাগে আরও কিছু সময় আবশ্যক হইত। ইহা ও জগতের রীতি। এইজন্যই জগাই মাধাই যখন ধার্ম্মিক হইল, তখন তাহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চে উঠিল। এই কারণেই ইংরাজিতে প্রবাদ আছে যে, Best men are moulded out of faults.

অনুতাপের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পাপে পাপ বলিয়া পদ্মাবতী তাহা ত্যাগ করে নাই। পাপের সুখ নাই বলিয়া, শান্তি নাই বলিয়া সে তৎস্পৃহা ত্যাগ করিল। সুখান্বেষণই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি।

'ধর্ম্ম সুখের জন্য'—এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য ও প্রকাশযোগ্য। ইহা গোপন করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। ধর্ম্মে আর কি আছে ? ধর্ম্মাচরণই সুখ ও ধর্ম্ম সুখের জন্যই বটে।

পদ্মাবতী আর একটি তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুখের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইলে কিছুতেই সুখ হয় না। যে প্রকৃত সুখ চাহিবে, কিছুকালের জন্য তাহাকে সে কথা ভুলিয়া নিষ্কামভাবে যথাকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই যথাকার্য্য সম্পাদনই ধর্ম্ম, এবং এইরূপ নিষ্কামভাবে তাহা আচরণ করিলেই সুখ হইবে। কহিয়া বলিয়া সুখ ধরা যায় না। মনের খবর জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এ সুখ পলাইবে।

পদ্মার জীবনের প্রথমভাগে আসক্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় না। লুৎফউন্নিসা স্বমুখেই বলিয়াছেন, তিনি আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসেন নাই। সেলিমের রমণীজিৎ কান্তিও কখনও তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং তাহাকে পাষাণহৃদয় বলিয়াছেন। আসক্তিটা লোকের মৌলিক প্রকৃতি। পদ্মাতে তবে তাহা বিকশিত হয় নাই কেন?

আমরা ইহার কারণ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহি। আসক্তিতে একটা বন্ধন স্বীকার করা চাই। ভালবাসা এক প্রকার অধীনতা। স্বাধীনতা-প্রিয় পদ্মা তাহা স্বীকার করিতে চাহিত না। সামান্য বারস্ত্রীর ন্যায় অর্থ, সম্পদ, সম্মান ও ইন্দ্রিয়সুখই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইহার প্রত্যেকটিই ভালবাসার শত্রু-স্বরূপ। সুতরাং মানুষে তাঁহার আসক্তি না জন্মিয়া যথেচ্ছা ইন্দ্রিয়সুখ পরিতৃপ্তি ও বিষয়-ভোগ-বাসনায় তাঁহার আসক্তি ছিল। এইরূপ সুখে আসক্তি থাকা প্রযুক্ত, কোন একটি মনুষ্যে তাঁহার আসক্তি স্থির থাকিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়-জনিত যে মনুষ্য প্রতি একটা আসক্তি, তাহাও পদ্মাতে স্থির থাকিতে পারিত না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ও সম্মান প্রভৃতিরও একটি উচ্চ আশা পদ্মার মনে ছিল। এ সমুদয় জড়াইয়া, সেলিমের প্রতি তাঁহার আসক্তির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু মেহেরউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত সেলিমের প্রতি, গর্ব্বিতা পদ্মার অনুরক্তি হইল না। প্রত্যুত ইহাতে সে সেলিমের প্রতি বিরক্তই হইল। পদ্মা নিজের সুখকে বড়ই ভালবাসিত। এই স্বার্থপরায়ণতার জন্য তাহার

আসক্তি কোন খানে জমাট বাঁধে নাই। এইরূপ আসক্তি-শূন্য হৃদয়ই পৃথিবীর সকল প্রকার পাপের আধার। প্রকৃত ভালবাসা নিষ্কামপ্রবৃত্তি। সুখের বাসনা ইহাতে তিষ্ঠিতে পারে না, অভিমান ও স্বার্থ ইহাতে থাকিতে পারে না, ইহা এক প্রকার নিষ্কাম ধর্ম্মও বটে। সৎ প্রবৃত্তির এমন অধীনতা আর কিছুতেই দেখা যায় না; এত আত্মবিস্মৃতি, এত পরের চিন্তা আর কিছুতেই দেখা যায় না। ইহাতে সুখও অনন্ত। সুখ চাহিয়া কেহ ভালবাসে না, কিন্তু ভালবাসিলেই সুখ হয়। পদ্মা সুখের লাগিয়া হাহাকার করিত, সুখ পাইবার জন্য কতবিধ উপায় অবলম্বন করিত, কত কল্পনা করিত, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের ভালবাসা জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত সে সুখে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

জীবনের মধ্যভাগে পদ্মার হৃদয়ে এ ভালবাসা অঙ্কুরিত হইল। সুখান্বেষণ করিয়া পদ্মা যখন দেখিতে পাইল যে, সুখটা খুঁজিলে পাওয়া বড় দুষ্কর, সে এক প্রকার সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। একটু একটু সেলিমের মহিষীপদ তখনও লোভনীয় হইল বটে, কিন্তু বিবিধ কারণে তাহা দৈব-

ঘটনায়ই অন্তর্হিত হইতেছিল। পদ্মার হৃদয়ে যখন এইরূপ সুখসম্বন্ধে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছিল, তখন এক দিন পথিমধ্যে তাহার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার রূপবান পুরুষও বটেন— বিশেষ পুরুষজাতির সহিত রসালাপ করিতে, ও পুরুষহৃদয় জয় করিতে পদ্মাবতীর আশৈশবই উৎসাহ—পদ্মা তাই নবকুমারকে ধরিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। যখন সেই পরিচয় হইল, পদ্মার হৃদয়ের এক নূতন গতি হইল। বহুদিনের পর সেই পতির সহিত সন্দর্শন—আবার পতি সপত্নী সহিত যুক্ত। অনেক দিন হইতেই অনাসক্তির দুঃখ বুঝিয়া পদ্মার অন্তঃকরণে আসক্তির একটা স্পৃহা জন্মিতেছিল। কিন্তু পাত্র মিলিতেছিল না। যথেচ্ছা ইহা হওয়া অসম্ভব। যেখানে যথেচ্ছা ইচ্ছা হয়, সেখানে আমরা রূপের প্রভাব প্রভৃতি কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই। আমরা যথেচ্ছা এইরূপ আসক্তির সঞ্চারে প্রায়ই প্রকৃত আসক্তি দেখিতে পাই না। এই জন্য একটা বন্ধন চাই। একটা প্রতিজ্ঞা চাই। বিবাহ এইরূপ একটি বন্ধন। ইহাতে ভালবাসা জন্মাইয়া

থাকে এবং বিবাহের পর যে ভালবাসা জন্মে, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। যাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাঁহাদিগেরও প্রকৃত অনুরাগ মোহ, ভালবাসা নহে। পুনঃ পুনঃ সম্ভোগে যখন সে মোহ অপসারিত হয়, তখন সে আসক্তিটুকু থাকে, তাহাই প্রকৃত। হিন্দুরা ইহা খুব বুঝিতেন। তাই হিন্দুর বিবাহ-প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র রকমের। যেরূপ মোহের কথা বলা হইল, তাহা প্রকৃত প্রণয়ের সহিত যুক্ত থাকিলে যে প্রণয়টি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু সেটুকুর জন্য অনেক সময়ে আমাদিগকে বড় বিপদ-গ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই হিন্দুর অনুরাগ বিবাহের পরে। আগে প্রতিজ্ঞা, শেষ ভালবাসা। সঙ্কল্প ভিন্ন কার্য্য হয় না। বিনা অভ্যাসে ভালবাসাকে কে স্থির ও স্থায়ী রাখিতে পারে? এ সকল কথা কিছু পদ্মা জ্ঞাতভাবে ভাবেন নাই; কিন্তু অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই এই সকল কথা মুহূর্ত্তমধ্যে জড় হইয়া একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্ম্মাণ করিল। সেই পদার্থের গুণে পদ্মা নবকুমারকে তাঁহার আসক্তির প্রকৃত পাত্র মনে করিলেন ও তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন।

ইহার অন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতীর ন্যায় আমাদিগেরও উত্তর 'ললাটলিখন'?

এই আসক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক। "ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমাণ হইল। আর, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনো-যোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে—চাহি কি ক্ষেত্র অনন্য-পাদপ হয়।

"লুৎফউন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত

সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বীজে অঙ্কুর, জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্রের ধর্ম্ম এই যে, মানসিক কর্ম্ম যত অধিকার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহসনলালসাও তাহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া – পদ্মাবতী প্রিয়জনসন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সেই প্রিয়জন নবকুমার।

"এই জন্যই লুৎফউন্নিসা মেহেরউন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ রক্ষার কোন যত্ন

পাইলেন না ; এই জন্যই জন্মের মত বাদসাহের নিকট বিদায় লইলেন।”

কথাটি বেশ পরিষ্কার হইয়া পড়িল।

এই নবকুমারের প্রতি আসক্তির প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার পদ্মার সেই একটানা ভাব উপস্থিত হইল। এখন নবকুমারকে পাইবার ইচ্ছাই তাঁহার একমাত্র ইচ্ছা। ইহার সহিত অন্য কিছুর বিরোধ হইল না। নবকুমারের সহিত পুনঃ সাক্ষাতে এ দুর্জ্জয় স্রোতের ভাব আমরা নিরীক্ষণ করিলাম।

একদিন এক সজ্জিত কক্ষায় লুৎফউন্নিসা রহিয়াছেন। পৃথগাসনে নবকুমার উপবিষ্ট আছেন। কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত করিয়া নবকুমার কহিলেন, ‘তবে এক্ষণে আমি চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।’ লুৎফউন্নিসা কহিলেন ‘যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।’ নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফউন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আর কি বলিবে?’ লুৎফউন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; লুৎফউন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'কি বল না?' লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, 'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকল দিব কিছুই তাহার প্রতিদানে চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী।' নব-কুমার কহিলেন, 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।' লুৎফউন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফউন্নিসা আবার তাহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন, 'ভাল সে যাউক বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব'।"

অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যে

পদ্মাবতী একদিন দিল্লীর সিংহাসনপ্রার্থিনী হইয়াছিল, সেই আজি নবকুমারের দাসী হইতে চলিল। যে এতদিন ইন্দ্রিয় সুখকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিত, সে আজি কেবল নবকুমারকে দেখিবার জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। প্রণয়ের এইরূপই আধিপত্য বটে। পদ্মাবতীর প্রণয়ের খরস্রোতে অন্য সব ভাসিয়া গেল।

ইহার পরে পদ্মাবতী যাহা করিল, এই মনোবৃত্তি লইয়াই। তাহার উল্লেখ প্রয়োজন নাই।

পদ্মাবতী আদিতে যেরূপ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসিতেছিল, এখনও সেইরূপ ভাসিতে লাগিল। তবে, পার্থক্য এত খানি যে, পূর্ব্বের প্রবৃত্তি পঙ্কিল ছিল, শেষের প্রবৃত্তি প্রায় নির্ম্মল। 'প্রায়' বলিলাম এইজন্য যে এখনও পদ্মাবতী পাপের হস্ত হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে পারে নাই। নবকুমার তাহার স্বামী, নতুবা এখনও তাহাকে প্রণয়াসক্তা বেশ্যা বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত সে যেরূপভাবে কথা কহিল, কপালকুণ্ডলার সহিত সে যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহাতে সে উচ্চ শ্রেণীর বারনারী ভিন্ন অন্য আখ্যা পাইবার যোগ্যা নহে।

তবে তাহার পূর্ব্ব প্রকৃতি ভাবিয়া দেখিলে, সে সংশোধনের পথে আসিয়াছে, ইহাও বলা যায়। পূর্ব্বে অন্তঃকরণে অনুরাগ ছিল না, এখন অনুরাগ হইল এবং সেই অনুরাগ স্বামীর প্রতি—তাই ভরসা করি, পদ্মাবতী কালে সংশোধিতা হইয়াছিল। এতদতিরিক্ত কিছু বলা যায় কি? প্রকৃত প্রণয়ের অভাব ও সদ্ভাবেই এই পার্থক্য জন্মাইল। পদ্মাবতী কিন্তু আগা গোড়া একভাবে ঐক্য রহিল—পদ্মাবতীর চিত্র বঙ্কিম বাবুর কম কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে!

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিতাবলী।

১। নবকুমার।—কবি নবকুমারকে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণে বিভূষিত করিয়া কপালকুণ্ডলার যোগ্য প্রণয়পাত্র করিয়া গ্রন্থমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নবকুমার পরোপকারী—পরের জন্য স্বীয় জীবন-ভয় তুচ্ছ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে, অপরিচিত ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবকুমার ধীরপ্রকৃতি, সাহসী, অধ্যবসায়ী—'যে কর্ম্মে তিনি প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া

তাঁহার অভ্যাস ছিল না।' নবকুমার ভাবুক সহৃদয়—সমুদ্রদর্শনমানসে, দস্যুভয়-সঙ্কুল নদীপথে গঙ্গাসাগর গমন করিয়াছিলেন—আবার যখন তিনি সমুদ্রতটে ভয়ানক বিপদাবস্থায় পতিত হয়েন, তখনও জলধিশোভা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃতিময় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নবকুমার শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী। নবকুমার বলবান—কাপালিকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি সমধিক বলপ্রকাশ করিয়াছিলেন। নবকুমার প্রণয়ী—কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার আনুরক্তি গ্রন্থমধ্যে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। নবকুমারের সেই সন্দেহের অন্তর্দাহে, কপালকুণ্ডলাকে এজন্য কিছু না বলিয়া নিজের প্রাণ সংহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, সেই কাপালিকের সহিত শেষ সন্দর্শনে প্রথম হর্ষোদয়ে, পরে ভয়শূন্যাবস্থায় আত্মসমর্পণে, আর তাঁহার অন্তিমের সেই উচ্ছ্বসিত সরল বাক্যাবলীতে, আত্মত্যাগে, এ আনুরক্তি অতি সুন্দর, অতি মধুরভাবে, পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিতেছে। কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে প্রস্তুত হওয়ায় নবকুমারের নির্দ্দয়তা প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, তাহাতে নবকুমারের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। নব-

কুমার যাহা দেখিয়া যাহা বিশ্বাস করিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সেই সময়ে আবার দুরন্ত কাপালিক কত কথা বলিয়া, ভৈরবীর আজ্ঞা বলিয়া নবকুমারকে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্যে প্ররোচনা জন্মাইতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাই কি যথেষ্ট নহে? কিন্তু ইহার উপরও আর কিছু হইয়াছিল। কাপালিক কৌশলে নবকুমারকে সুরাপান করাইয়া দিয়াছিল—নবকুমারের সেই প্রথম সুরাপান—ইহাতে কি জ্ঞান থাকিবার কথা? এ কার্য্যে নবকুমার অপরাধী নহে। নবকুমারের প্রণয়ে কিছুমাত্র পঙ্কিলতা ছিল না।

নবকুমার ধার্ম্মিক, চিত্তজয়ী—অমন পদ্মাবতীকে তিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরুষের আর কি চাই বল? কিন্তু তবু কপালকুণ্ডলা এহেন নবকুমারকে লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না। হাজার হউক নবকুমার সামাজিক জীব। কপালকুণ্ডলা সমাজ চিনিতেন না। বিবাহ প্রভৃতি সমাজ-বন্ধনের সূত্রও তিনি ভাল বুঝিতেন না। কপালকুণ্ডলার অপরিবর্ত্তিত বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত মৌলিক প্রকৃতি নবকুমারের সামাজিক প্রকৃ-

তির সহিত মিশিতে পারিল না। একেবারেই কি পারিল না? তাহা নহে। তোমরা আমরা যাহাকে মিশা বলি, তাহাই ঘটিল না। কপালকুণ্ডলা সামাজিক পত্নী হইয়া থাকিতে পারিল না।

২। **শ্যামাসুন্দরী**।—যেমন একদিকে পদ্মাবতী, তেমন অন্যদিকে শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছেন। পদ্মাবতী সংসারের পঙ্কিল কীট, কপালকুণ্ডলা অরণ্যের পবিত্র প্রসূন। পদ্মাবতী শুদ্ধ অদৃষ্টবাদ বুঝাইতেই কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (Duplicate) নহে, পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার পরোপচিকীর্ষা, সরলতা ও সর্ব্বোপরি পবিত্রতাও প্রদর্শন করিতেছে। কপালকুণ্ডলা নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াও অপরিচিত নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করিল, পদ্মাবতী স্বীয় প্রণয়ভাজন, উপকারী বান্ধব সেলিমকে রাজ্যচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল—নিজের সুখের জন্য অমন কপালকুণ্ডলাকেও স্বামিত্যাগ করাইতে প্রস্তুত হইল। যেরূপ পদ্মাবতী, ঠিক সেইরূপ না হউক, শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (Duplicate)। পাঠক একবার সেই

শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথন স্মরণ করুন—একদিকে কুলীনপত্নী স্বামিবিরহিণী শ্যামাসুন্দরী, স্বামীসোহাগের জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছে, অন্য দিকে তাহারই কাছে বসিয়া কপালকুণ্ডলা অমন দেবদুর্লভ স্বামী নবকুমারের অমন আনুরক্তি অবাধে অগ্রাহ্য করিতেছে। এক দিকে শ্যামাসুন্দরী সংসারের সমস্ত সুখগুলি নিজে মুগ্ধচিত্তে দেখিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছে ও দেখিয়া মুগ্ধ হইতে বলিতেছে, অন্য দিকে কপালকুণ্ডলা সংসারের কিছুতেই সুখ না দেখিয়া সেই বনে বেড়াইবার সাধ প্রকাশ করিতেছে। কি সুন্দর যুগল চরিত্র! কপালকুণ্ডলাকে শ্যামাসুন্দরীর কাছে আনিয়া কবিবর তাহাকে যেন সমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন—দিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাতেও কপালকুণ্ডলার বাল্যশিক্ষা পরিবর্ত্তিতা হইল না।

শ্যামাসুন্দরী ও পদ্মাবতী সংসারের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই ভাগের দুইটি ছবি। সংসার ছাড়া কপালকুণ্ডলার সহিত ইহারা উভয়েই তুলনীয়।

আবার পদ্মাবতীর যেমন একটি স্বতন্ত্র জীবন

আছে, শ্যামাসুন্দরীরও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইতে কবি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও, ইহাদের চরিত্রে সে ভাগ ছাড়া আরও কিছু আছে। পদ্মাবতীর কথা বিস্তৃত, তাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে; শ্যামা-সুন্দরীর কথা সংক্ষিপ্ত, তাহাই এই স্থলে বলিব।

শ্যামাসুন্দরীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অর্থাৎ চিত্রের রেখাপাতগুলি বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। যেমন সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর বিভিন্ন "বাদী" (জান) থাকে, সেই ভাগটা জানা থাকিলেই, বাকী ভাগটা অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন "জান" থাকে, চরিত্রের সেই ভাগটা জানিতে পারিলেই, অন্য ভাগটা সহজেই জানা যায়। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের এই অন্তর্ভাগটি (জান) কবি খুলিয়া দেখাইয়াছেন—তাই শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হইয়া থাকিলেও, চিত্রটি সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কথাটি ক্রমে খুলিয়া বলিতেছি।

কপালকুণ্ডলার "অবরোধে" নামক অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ।

শ্যামাসুন্দরী মৃণ্ময়ীর নিকটে একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন ; যথা,—

“বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছিছি—শরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখ্‌তে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥
তুই কিলো একা তপস্বিনী থাকিবি ?”

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, “কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?”

(ইহার পরভাগ সমস্তই আমরা ২০—২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া পাতা কয়েকটা উল্টাইয়া সেই স্থানটি একবার পড়িয়া লইবেন)। ইহার পর আর এক দিন মাত্র শ্যামাসুন্দরীকে আমরা দেখিয়াছি। সেদিন শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছেন।'

“কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'ঠাকুরজামাই আর

কতদিন এখানে থাকিবেন ?' শ্যামা কহিলেন, 'কালি বিকালে চলিয়া যাইবে।' আহা ! আজি রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তাঁরে বশ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে ?" ইত্যাদি— সমগ্র উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এই অধ্যায় দুইটি, বিশেষতঃ প্রথমটি পড়িয়া আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি শ্যামাসুন্দরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। মুখখানি মধুর আনন্দে ভরা—হৃদয়খানি সংযত প্রেমলালসায় পরিপূর্ণ। শ্যামাসুন্দরী যুবতী— সংসার যেন এখন তাঁহার নিকট সুখের সামগ্রী-গুলিকে সুবর্ণবর্ণে বিভাসিত করিয়া একখানি চিত্র-পটে আঁকিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে। সেই সামগ্রীগুলি শ্যামাসুন্দরীর বড়ই প্রীতিকর—তাহা পাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরী বড়ই লালায়িত। কিন্তু সে সামগ্রীগুলি কিছু দূরে—শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে তাহা সহজপ্রাপ্য নহে, তাই শ্যামাসুন্দরী হর্ষবিষাদে মিশ্রিত মনোভাব লইয়া তদ্দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

সুখ—জিনিসগুলি দেখিয়া, তাহার মনোহারিত্ব কল্পনা করিয়া ; দুঃখ—তাহার অপ্রাপ্যতা বা কষ্ট-প্রাপ্যতা নিবন্ধন। সম্মুখে কপালকুণ্ডলা বসিয়া রহিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরী সেই চিত্রপটখানির সৌন্দর্য্য তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। কপাল-কুণ্ডলা কিছুই বুঝিতেছে না—শ্যামাসুন্দরী তাহাকে বুঝাইবার জন্য কত চেস্টা করিতেছেন—চিত্রপটের রঙগুলি সহস্রগুণে সুন্দর করিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছেন ও সে বুঝিতেছে না বলিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আমার অতি প্রিয় দুর্লভ দ্রব্যকে যে ব্যক্তি সহজে পাইতে পারে সে যদি তাহা পাইবার চেস্টা না করে, তবে যেমন আমার মনে ক্ষোভ হয়, শ্যামাসুন্দরীর তাহাই হইতেছিল। যাহা তাঁহার চক্ষে এত প্রীতিকর, কপালকুণ্ডলা তাহা সহজেই পাইতে পারে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহা চাহিতেছে না। হায়! শ্যামাসুন্দরীর যদি ঐরূপ হইত, তবে না জানি তিনি কত সুখীই হইতে পারিতেন, এইরূপ একটা কথা তাঁহার মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রীড়া করিতেছে।

পাঠক, স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়া পরমিলনদর্শনেচ্ছু

বিরহিণী শ্যামাসুন্দরীরর মূর্ত্তিটি সুন্দর নয় কি? শ্যামা কুলীনপত্নী—স্বামী সোহাগে প্রায়ই বঞ্চিত। অথচ স্বামিসোহাগ যে কি পদার্থ তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। বিরহের সুশীতল ছায়ায়, কল্পনার বারিসেকে সে ভাবটি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া লতার ন্যায় এখন তাহা সমগ্র শ্যামাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী এখন সেই লতা-ভারে অবনতা। সম্মুখে কপালকুণ্ডলাকে সেই স্বামিসোহাগের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিতেছেন। সংসা-রের সুখগুলি তাহাকে বলিয়া দিতেছেন—সংসার চিনিলেই কপালকুণ্ডলা স্বামী চিনিবে। যাহাতে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত মিলিতা হয়, শ্যামা-সুন্দরীর এখন কেবল সেই চেষ্টা। বিরহিণীগণ অপরের মিলন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত একরূপ মৃদু মধুর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। কপাল-কুণ্ডলা গম্ভীরা প্রকৃতি—স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কোন চেষ্টা নাই। দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিত—শ্যামাসুন্দরী ভাবিতেছেন—'তাও কি হয়? স্ত্রী কি স্বামীর মন তুষ্ট করিতে যত্নবতী না হইয়া থাকিতে পারে? কপালকুণ্ডলাও তবে যত্ন করে।

বুঝি তাহা গোপনে করে।' তাই শ্যামাসুন্দরী উক্ত শ্লোক পড়িতে পড়িতে তাহাই ভাবিতেছিলেন ও কপালকুণ্ডলাকে তাহাই ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলাকে যখন কিছুতেই আপন মতে আনিতে পারিলেন না—আপনার মত প্রেমোন্মাদিনী করিতে পারিলেন না, তখন শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কল্পনার স্বপ্নে-দৃষ্ট সংসারের চিত্রপটখানি, তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন, 'বাঁধাব চুলের রাশ,' ইত্যাদি। শ্যামাসুন্দরীর নিকটে ইহাই স্বর্গসুখ—স্তরে স্তরে কাব্যময় বর্ণনা উপরে উঠিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, 'সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কি না লাগে।' কথাটি শ্যামাসুন্দরীর আকাঙ্ক্ষার কথা—তাঁহার সুখের চরমোৎকর্ষের কথা। কি সুন্দর—কি স্বাভাবিক। ইহাই রমণীর কথা। শ্যামাসুন্দরী কথাটি বলিয়া জয়াশা করিয়া না জানি কি সুন্দর-ভাবেই কপালকুণ্ডলার দিকে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আনন্দের সহিত শ্যামাসুন্দরীর একটু দুঃখের ভাবও মিশ্রিত ছিল। উভয়ের মিশ্রণে যেরূপ হর্ষভাবটি সঞ্জাত হয়, গ্রন্থকার তাহা প্রথমে

আমাদিগকে দেখাইলেন—শেষে যখন মৃণ্ময়ী বলিল —(ফুল ফুটিলে) 'লোকের দেখে সুখ; ফুলের কি ?' কবি আমাদিগকে সেই হর্ষবিষাদ মিশ্রণে যে দুঃখ-ভাবটি সঞ্জাত হয়, তাহাও দেখাইলেন। পূর্ব্বে দুঃখমিশ্রিত সুখ দেখিয়াছি—এখন সুখমিশ্রিত দুঃখ দেখিলাম। কুলীনপত্নী হিন্দুরমণী শ্যামা ফুটিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু পাঠক-বর্গকে সুখী করিয়াছেন। মৃণ্ময়ীর কথাটিই ঠিক হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা শ্যামাসুন্দরীকে যেরূপ দেখিলাম শেষ অধ্যায়ে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইলাম না। প্রথম অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরী নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মিলন ও সুখ দেখিবার জন্য লালায়িত—শেষ অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরী নিজের সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত। স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামিপ্রাপ্তির জন্য সে সব করিতে পারে। শ্যামাসুন্দরীর অমন নির্ম্মল হৃদয়েও স্বামীর কথায় একটু মলিনতা পড়িল। সেই মলিনতাও বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই শ্যামাসুন্দরীর মত। অদ্য শ্যামাসুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অসন্তোষ-

ভাজন করিয়াও স্বামী-বশীকরণের ঔষধ সংগ্রহে কপালকুণ্ডলাকে বনমধ্যে প্রেরণ করিতে মনে মনে প্রস্তুত। প্রকাশ্যে নিষেধ করিতেছেন—কিন্তু মনের অভিলাষ অন্যরূপ। অমন স্বামিসোহাগ-লালসা-পূর্ণ শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় ত এইরূপই হইবে।

তবেই আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি, শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গীতের প্রাণ—বিরহিণীর মিলন-পিপাসার অপরিতৃপ্তিজনিত দীর্ঘশ্বাস, অন্য দম্পতি-মিলন-দর্শন-লালসা যুবতী হৃদয়ে স্বাভাবিক আনন্দে আনুরক্তি ও রসপ্রবণতা—সংসারীর অনাস্বাদিত সংসার সুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৎপ্রতি কল্পনার মোহময় মধুর দৃষ্টি। যে সঙ্গীতের এইরূপ প্রাণ তাহা মধুর নয় কি?

৩। অধিকারী।—বঙ্কিমবাবুর প্রায় উপন্যাসেই এইরূপ এক একটি দরিদ্র, কামনা-বিশেষে প্ররত, চরিত্রবিশেষের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকে। দুর্গেশনন্দিনীর অভিরামস্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য্য, চন্দ্রশেখরের রমানন্দস্বামী, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দের গুরু, দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক ও সীতারামের চন্দ্রচূড় অল্পা-

ধিক পরিমাণে আমাদিগের দৃষ্টান্ত স্থল। স্থানান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার, বলিব। এখন এই সাদৃশ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

৪। কাপালিক।—কপালকুণ্ডলার কোমলতা সমীচীন স্ফুটিত করিবার জন্য দুরন্ত কাপালিক কল্পিত হইয়াছে। করাল কাদম্বিনী পার্শ্বে বিদ্যুতের বিকাশ যেরূপ মনোহর, দুর্দ্দান্ত কাপালিকের পার্শ্বে দয়াময়ী কপালকুণ্ডলাও তদ্রূপই মনোহর। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ গুণ-বিশিষ্ট—কিন্তু উভয়ের সংস্থান আবার একস্থলে। ইহাই জগতের নিয়ম। যেখানে নির্দ্দয়তার নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রকাশিত,—সেই খানেই আবার দয়ার সুকোমল হস্তও প্রসারিত।

৪। ভাষা—বর্ণনা ইত্যাদি।

ভাষা।—'কপালকুণ্ডলা'র ভাষায় কিছু শব্দাড়ম্বর ও সমাসচ্ছটা পরিলক্ষিত হয়। শেষের উপন্যাসগুলির ন্যায় ইহা সম্যক্ প্রাঞ্জল নহে। এ সম্বন্ধে অন্য কথা অন্যত্র বলা হইবে।

বর্ণনা।—কপালকুণ্ডলার বর্ণনাগুলি অতি পরিপাটি। এই বর্ণনাগুলির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে ইহা অতি সুন্দর-রূপে মিশিয়া রহিয়াছে। জড়প্রকৃতি ও মনোপ্রকৃতির এইরূপ সুন্দর সঙ্গত কাব্যে অতীব প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক। বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য সমস্ত উপন্যাস অপেক্ষাই 'কপালকুণ্ডলা' এ অংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অনেকে এজন্যও কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে ইহার কয়েকটি বর্ণনা পাঠকবর্গকে উদ্ধৃত করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

নবকুমারের সঙ্গীগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবকুমার সেই লোকালয়শূন্য বালুকাস্তূপশ্রেণী মধ্যে বসিয়া একাকী। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, তাঁহার জঠর জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। "দুরন্ত শীতনিবারণের জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন

করিয়া থাকিতে হইবে। হয়ত রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ভল্লুকে প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত। এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্র মণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই প্রস্তুত হইল। দৃশ্যটী যেন নবকুমারের অবস্থার সহিত—নবকুমারের চিন্তার সহিত এক লয়ে বাঁধা। ইহা ত যেন সহজেই পাঠকের মানসপটে সমুদিত করা যায়, কিন্তু "শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল; ইহা বুঝান আমাদিগের সাধ্যাতীত। কথাগুলি যেন ঠিক সেই আকাশের নক্ষত্রাবলীর

ন্যায় নীরবে এই বর্ণনামধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার কোন্ কথা ব্যাখ্যা করিব? 'শিশিরাকাশে'? 'নীরবে'? না, 'ফুটিতে'? ইহার কোন্ ভাব ব্যাখ্যা করিব? সেইরূপ সমুদ্রতীরস্থ নির্জ্জনপরিত্যক্ত আশাশূন্য নবকুমারের নিকট সেই শূন্য প্রদেশের নীরবের নক্ষত্রোদয়? না, সেই নক্ষত্রোদয় দেখিয়া নবকুমারের সেই চিরপরিচিত স্বদেশের নক্ষত্রোদয়ের নীরব স্মৃতি—সেই যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল?" ইহার ব্যাখ্যা? ভাবের ব্যাখ্যা করিব, না ভাবপ্রকাশের অপূর্ব্ব শক্তি ব্যাখ্যা করিব? আমরা কিছুই করিব না—কিছুই করিতে পারিব না। এ সঙ্গীত আমরা গাহিতে অক্ষম—তাই কেবলমাত্র সঙ্গীতটীর স্বরলিপি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদিগেরই মতন গাহিতে না জানেন, তাঁহারা মৃদুমধুর নিনাদে সেতারঝঙ্কারবৎ এ সঙ্গীতের ধ্বনি মানসকণ্ঠে উত্থিত করিয়া সুখানুভব করুন। আর যদি কেহ এ সঙ্গীত গাহিতে জানেন, গলা ছাড়িয়া মধুর ভৈরবে ইহার সুস্বররাশি এইরূপ আকাশের দিগন্তে ভাসাইতে পারেন, তাঁহার সাধ পূরাইয়া সঙ্গীত-ক্ষমতার সার্থকতা লাভ করুন;—

আমরা দূর হইতে অনন্যকার্য্য—অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করি; শুনিয়া শুনিয়া সংসারতাপে জর্জ্জরিত এ শ্রান্ত হৃদয়খানিকে একবার সেই নবকুমারের মত তন্দ্রাভিভূত করি। হায়, ইহা কি কেহ গাহিবে না?

২। নবকুমার ফলমূলান্বেষণে এক নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে—

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র, উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপকৃত বিমল কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায়; সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ

হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশে দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি হৃদয়ে উড়িতেছিল। কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম সন্ধান করিতে হইবে। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * *

গত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন—"অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফ;

লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র-পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।”

মনোহর দৃশ্যপট। এখানেও আমরা সেই সাগর বর্ণনা, সেই সাগরতীরস্থ সুন্দরী বর্ণনা, সেই একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—ইহার কিছুই বলিব না। আমরা বলিব সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দণ্ডায়মান কপলকুণ্ডলার মূর্ত্তির সহিত, নবকুমারের তাৎকালিক হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব লয়ের কথা—সেই অপূর্ব্ব সুরসংযোজনার কথা অনন্ত-বিস্তৃতা নীলবসনা বারিধি দেখিয়া নবকুমারের কাব্যময় হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ অস্পষ্ট অজ্ঞাত

চরিত্র সুখের মৃদু হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সন্ধ্যালোকের ন্যায় সেই আধভাঙ্গা অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্ন লইয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তদবস্থ দেখিলেন—স্বপ্ন পূর্ণ হইল, অস্পষ্ট স্পষ্ট হইল। সে সুখের সহিত এ সুখ যেন বিনা ওজরে মিশিয়া গেল। সঞ্চিত উপলরাশিবিভক্ত সলিল-রাশি যেরূপ উপলোন্মোচনে মিলাইয়া যায়, নব-কুমারের সেই সমুদ্র দর্শনজনিত মনোভাব যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষ জনিত চিত্তভাবের সহিত মিলাইয়া গেল ! নবকুমার এক সমুদ্র পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন—আর এক সমুদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই তেমনই শোভান্বিত, তেমনই চিত্তমোহনকারী, তেমনিই চিত্তভাব বিশ্লেষী !

৩। কপালকুণ্ডলা শ্যামার জন্য ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছেন—উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নিজের স্নিগ্ধ কিরণরাজি নিশীথজগতের ক্রোড়ে অকাতরে ছড়াইয়া দিতেছে কি অপূর্ব্ব সুন্দর মিলন—সেই স্নিগ্ধ রশ্মিময়ী চন্দ্রমাশালিনী মাধবী যামিনীর সহিত কপালকুণ্ডলার সেই পরোপচিকীর্ষার কি অদ্ভুত মিলন হইল। দেখিয়া দেখিয়া আবার

কপালকুণ্ডলার অতীতস্মৃতি কেমন সুন্দরভাবে সুরে মিশিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আবার ঘটনার পীড়নে যখন কপালকুণ্ডলা অন্যরূপ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইল, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন সুরে আর একটি সঙ্গীত গীত হইল। ইহার পরে যখন "বিদ্যুতালোকে" কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণ ভূমিতে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ—সেই কাপালিক—সুর পঞ্চমে উঠিল।

৪। "সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টক রচিত। এই গৃহের সৌধোপরি দুইটি নবীনা রমণী দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন;

তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরীর সৌধমালা, নববসন্ত-পবন-স্পর্শ-লোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্যদিকে অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশালবক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।"

এই স্ত্রীলোক দুইটি শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা। কি সুন্দর সুরসম্মিলন! এক দিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে সংসার—এক দিকে নিবিড় অরণ্য, বিশাল-হৃদয়া ভাগীরথী—অন্য দিকে সৌধমালা পরিবেষ্টিত নাগরিক পরিপূরিত নগর। এক দিকে কপালকুণ্ডলা, অন্য দিকে শ্যামাসুন্দরী।

৫। কপালকুণ্ডলা শ্মশানে আনীতা হইতেছেন—পাঠকবর্গ একবার সেই দৃশ্যটী মনে করুন।

ঐ দেখুন ঐ ভীষণ নর-শোণিত-পিপাসু নির্দ্দয়-তার কঠোর স্তম্ভ তান্ত্রিক কাপালিক খড়্গহস্তে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে—পশ্চাতে ঐ 'সুরা-গরল-প্রজ্বলিত-হৃদয়', পত্নী-চরিত্রে সন্দিহান, জীবনের মমতাত্যাগী, নবকুমার ভবানীভাব বিমোহিতা,

আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা, ঊর্দ্ধে স্থাপিতদৃষ্টি কপাল-কুণ্ডলাকে বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া প্রেতভূমিতে গমন করিতেছেন। সময় নিশীথিনী—স্থান শ্মশান-ভূমি! কপালকুণ্ডলা আকাশমণ্ডলে দেখিতেছেন—"নবনীরদ-নিন্দিত মূর্ত্তি। গলবিলম্বিত-নরকপাল-মালা হইতে শোণিত স্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে। বাম করে নর-কপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল-জ্বালা-বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপাল-কুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" যখন কপালকুণ্ডলা এইরূপ দেখিতেছেন, নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, 'কপালকুণ্ডলে'—কি সুন্দর সুরসম্মিলন ঘটিল। সবই ভয়ানক হইতে ভয়ানকতর। কিন্তু এই ভয়ানক কাদম্বিনী জাল হইতে শীঘ্রই আবার করুণা-বারি মুঞ্চিত হইয়া পাঠককে অপূর্ব্ব ভাবান্তরে বিস্মিত করত নয়নজলে অভিষিক্ত করিল। শ্মশান-ভূমিস্থ সেই নদী আর সেই নবকুমার ও কপাল-কুণ্ডলার কথা মনে করুন। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। 'বিশাল

তরঙ্গিণী-হৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহতবেগে গঙ্গা-হৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার কারণ তরঙ্গাভিঘাত-জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" দম্পতীর হৃদয়ের সহিত এই তরঙ্গিণীর কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পান কি? নবকুমার ও কপাল-কুণ্ডলার হৃদয়েও কি সেইরূপ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চৈত্রবায়ু প্রধাবিত হইতেছিল না, কে বলিবে? সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া কপালকুণ্ডলা ভৈরবী পদে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য যখন, পঞ্চভূতের বিষম বন্ধনটিও ছিঁড়িবার কথা ভাবিতেছিলেন, ছিঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয়খানি ঐ তরঙ্গিণীর মত বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গময় হইতেছিল না, কে বলিবে? যখন নবকুমার আপনার হৃৎপিণ্ড সদৃশ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহস্তে ছেদন করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, এই চৈত্রবায়ু-প্রক্ষিপ্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তখন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিবে? আবার দেখুন, যখন ধীরে ধীরে নবকুমারের চৈতন্য হইতে-

ছিল, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে রমণীসুলভ দয়ার ভাব বিকাশ পাইতেছিল,—সম্মুখস্থ নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল! কপালকুণ্ডলা যখন হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই,' যখন নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিতেছিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ—গৃহে চল!' তখন সেই নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইতেছিল। আবার যখন কথা কহিতে কহিতে কপালকুণ্ডলার সেই ভবানীর আজ্ঞা মনে পড়িল, বলিলেন, 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না' এবং নবকুমার 'না—মৃণ্ময়ি!—না'!—এইরূপ উচ্চশব্দ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন—চৈত্রবায়ু বিতাড়িত এক বিশাল নদী-তরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে

ভগ্ন হইয়া পড়িল।'—বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল না কি?

কপালকুণ্ডলার দুইটি ভাববর্ণনা আমাদিগকে বড়ই মোহিত করিয়াছে। একটি কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রণয় বর্ণনা ও অন্যটি পদ্মাবতীর ভাববিশেষ বর্ণনা।

নবকুমারের প্রণয় বর্ণনা স্থলে গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না। কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমিক চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত।" এই ছয়টি কথা, প্রত্যেকেই লাখ কথার এক কথা। এমন সহজ অথচ এমন

সুন্দর ও সঠিক প্রণয়লক্ষণ আর কোথাও দেখিয়াছ কি ? ইহার মধ্যে আরও একটু নিগূঢ়ত্ব আছে, পত্নীর প্রতি সাধারণতঃ পতির যেরূপ প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হয়, ইহা সেরূপ নহে। বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নী বা পতির মনোভাব জানিবার পূর্ব্বে যেরূপ প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হয়, ইহা সেইরূপ। যে তোমাকে ভালবাসে কি না জান না, যাহাকে প্রকাশ্যভাবে তোমার ভালবাসার কথা জানাইতে সঙ্কুচিত হও, যাহাকে ভালবাসিয়া তুমি ভালবাসার প্রতিদান প্রত্যাশা কর না বা পাইতেছ না, তাঁহার প্রতি তোমার যেরূপ প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হইবে, ইহা সেইরূপ চিহ্ন। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি ভাবিয়া দেখিলে নবকুমারের এইরূপই প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কবিবর ইহাও ভুলিলেন না। তাই বলি, এ প্রণয় বর্ণনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে।

আর একটি দেখ। কক্ষমধ্যে লুৎফউন্নিসা বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত নবকুমারের প্রেমালাপ চলিতেছে। লুৎফউন্নিসা নবকুমারের প্রতি অনুরক্ত, নবকুমার কিন্তু ইহাতে কিছু বিরক্ত। অনেক কথার পরে যখন নবকুমার বলিলেন "তুমি

আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।”

“‘এ জন্মে নহ।’ লুৎফউন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন,—

‘এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।’ মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম-গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, নবকুমারের মুখ-প্রতি অনিমিক্‌ আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল, যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্যশাসনকল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়-দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাট দেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতি-বিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি এ উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, ‘এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে’।”

"সেই কুপিত ফণিনী মূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফউন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখন দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল। এক দিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমনিই তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এমনই ললাটে রেখা বিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই,এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিতস্বরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, 'তুমি কে?'

"যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, 'আমি পদ্মাবতী'।"

এ বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর। ক্রোধোদ্দীপ্ত পদ্মাবতীর আকৃতি বর্ণনা অতীব মনোহারিণী! বর্ণনা পড়িয়া আমরা যেন তাহাকে এইরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তার পর আকৃতি দেখিয়া নবকুমারের পদ্মাবতীকে মনে পড়া আরও সুন্দর। অঙ্কুরেও বৃক্ষত্ব বর্ত্তমান থাকে। বাল্যকালের পদ্মাবতীতেও বর্ত্তমান পদ্মাবতী বিদ্যমান ছিল। নবকুমার পদ্মাবতীকে ইতিপূর্ব্বে এতবার দেখিয়াও চিনিতে পারেন নাই, এখন এই মূর্ত্তিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। বড়ই সুন্দর সত্য কথা। এক এক জনার এইরূপই এক একটা ভাব থাকে বটে। বাহুল্য বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজনীয়।

